হাত বাড়ালেই

সুবিধা

Suvida

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৬
নভেম্বর ২০১৩

দাম মাত্র দশ টাকা

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন
suvidamagazine লিখে

কালী কালো কৃষ্ণা!

- সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়-এর গল্প
- আদ্যাশক্তি নিয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়-এর প্রতিবেদন
- ‘মা’-এর পরীর পোশাকি বাহার
- ভাইফোঁটার ভোজ
- বয়সে মা
- শিশুর সু-শিক্ষা
- কালো মেয়ের সৌন্দর্য
- মিমি চক্রবর্তী-র সুন্দরবন সফর

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সূচিপত্র

চিঠিপত্তর	:	৪
শব্দ জব্দ	:	৪
সম্পাদকীয়	:	৫
কথা ও কাহিনি	:	৬
হেঁশেল	:	১২
বিশেষ রচনা	:	১৫
তুমি মা	:	২০
পোশাকি বাহার	:	২২
কাছে দূরে	:	২৪
কবিতা	:	২৬
ডাক্তারের চেম্বার থেকে	:	২৭
কথা ও কাহিনি ২	:	৩২
বিশেষ রচনা	:	৩৯
ভূত ভবিষ্যৎ	:	৪২

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
কাকলি চক্রবর্তী
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

প্রচ্ছদ মডেল : পাওলি দাম
ছবি : আশিস সাহা
রূপসজ্জা : অনিরুদ্ধ চাকলাদার

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

১৫ বিশেষ রচনা
কালী মাহাত্ম

কাছে দূরে
২৪ সুন্দরী সুন্দরবন

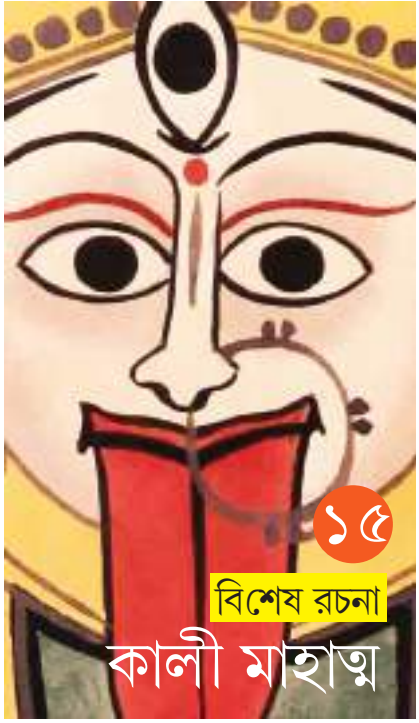

২৭ ডাক্তারের চেম্বার থেকে
বয়সে মা

তুমি মা
২০ শিশুর সু-শিক্ষা

মা-এর পরী যখন তিথি
পোশাকি বাহার
২২

হেঁশেল
১২ ভাই ফোঁটার ভোজ

পুজো সংখ্যা...

'সুবিধা'র অক্টোবর সংখ্যাটি সত্যিই ছিল লোভনীয়। একই মূল্যে চার চারটি গল্প ভাবা যায়! প্রতিটি গল্পই মন কাড়া। ভিন্ন স্বাদের। ভিন্ন রুচির, ভিন্ন ধারার। প্রচেত গুপ্তর গল্পে ছিল গা ছমছমে টুইস্ট ইন দ্য টেল। তৃণাঞ্জনবাবুর গল্পে আপাত হিউমার-এর মধ্যে এক গুঢ় মানসিক তত্ত্ব। বাণী বসুর কাহিনি যেন আমাদের সবার জীবনের অঙ্গ। অনুপ ঘোষালের গল্পেও ছিল ছোট গল্পের মুনশিয়ানা আপনাদের ধন্যবাদ এতটা পড়ার আনন্দ দিলেন বলে।

শান্তনু ঘোষ, উলুবেড়িয়া

নিখুঁত না হলেও ভাল

পুজোর জন্য যে মিষ্টির রেসিপি আপনাদের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সেগুলোর জন্য ধন্যবাদ। একটা দুটো ইতিমধ্যে ট্রাই করেছি, কিন্তু সবকটা তৈরি করে উঠতে পারিনি। নিখুঁতিটা করেছিলাম, নিখুঁত না হলেও মন্দ হয়নি। আপনাদের পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি

গীতা গায়েন, সোদপুর

কনিষ্কর শাড়ি

সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'মুক্ত নারী' নিয়ে আলোচনা আমার মনকে আলোড়িত করেছে। সেই সংখ্যায় প্রকাশিত কনিষ্ক বুটিক-এর শাড়িগুলো ছিল সত্যিই চোখকাড়া। বিশেষত লাল জমির উপর প্রিন্টেড পাড় ও আঁচলের শাড়িটা দেখে খুব লোভ হয়েছে। কলকাতায় গেলে একবার নিশ্চয়ই যাব ওই দোকানে, দেখতে আর কী কী আছে। ও বলতে ভুলে গেছি, 'পুজোর ক-দিনে নিরালা নির্জনে' শীর্ষক প্রতিবেদনে বিবৃত জায়গাগুলোয় যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

রুমঝুম দাশ, পুরুলিয়া

হরমোন থেরাপি

আপনাদের পত্রিকার 'তুমি মা' ও 'ডাক্তারের চেম্বার থেকে' বিভাগ খুবই কাজের। সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'হরমোন থেরাপি' নিয়ে লেখাটি কাজে লেগেছে। সেই সঙ্গে পুজোর আগে প্রকাশিত অক্টোবর সংখ্যার গল্পোগুলোও দারুণ। নিয়ন্ত্রিত খাদ্য তালিকা সংক্রান্ত লেখাও আমার ভাল লেগেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ মেয়েদের বেঁচে থাকার, ভাল করে বেঁচে থাকার রসদ আরও বেশি করে প্রকাশ করুন আপনাদের পত্রিকায়।

নীনা বারিক, সন্তোষপুর, কলকাতা

মানসিক বিনোদন

'সুবিধা' পত্রিকা আমার মতে একটি সামগ্রিক পত্রিকা। স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, খাওয়া দাওয়া, বেড়ানো, পোশাক, আইন, কী নেই এতে! তার উপর এর উপস্থাপনা দারুণ। দামও মাত্র ১০টাকা। যা দেওয়া তেমন কষ্টকর নয়। আপনারা এভাবেই আমাদের মানসিক বিনোদনের রসদ যুগিয়ে যান।

অনিতা বিশ্বাস, হাজরা

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

১	২			৩			
						৪	৫
৬		৭					
				৮	৯		
১০			১১				
					১২	১৩	
১৪							
			১৫				

পাশাপাশি

১। রাবণের বোন কুম্ভনসীকে বিবাহ করেন মধুদৈত্য, এদের পুত্রটি রাজ্যে দারুণ অত্যাচার করায় শত্রুঘ্নের হাতে নিহত হয়। ৪। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র, ফাঁস ৬। শ্রীকৃষ্ণের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বন্ধু। ৮। ব্রহ্মা এই দৈত্যের নাম দেন, কালনেমির কন্যা বৃন্দার সঙ্গে এর বিবাহ হয়, পাঞ্জাবের এক স্থান নাম। ১০। অগস্ত্যমুনিকে যে পর্বত প্রণাম করতেই বললেন আমি যতদিন না ফিরি ততদিন তুমি এমনি মাথা নত করে থাকো ; কিন্তু অগস্ত্য আর ফেরেননি। ১২। চতুর্দশ মনুর অন্যতম, ইতি চতুর্থ মনু। ১৪। পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্র, লৌহযষ্ঠি ১৫। ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক, দুর্যোধনের মামা।

উপরনিচ

২। বরদাত্রী, দুর্গা। ৩। এক অসুর যার প্রতিটি ফোঁটা রক্তে অসুরের জন্ম হত। ৫। এও এক পৌরাণিক অসুর, বড় হরিণও বটে। ৭। রাবণের যে অনুচর স্বর্ণমৃগ রূপে সীতাকে প্রলুব্ধ করে। ৯। দুর্গার এক নাম ১০। শ্রীক্ষেত্র, রাধিকার এক সখি ১১। দশরথের, দুই নাতি। ১৩। যোগলব্ধ অষ্ট ঐশ্বর্যের অন্যতম মাহাত্ম্য 'দেবতার—'।

সমাধান শব্দজব্দ ১৭

ল	ব	না	সু	র			
	র			ক্ত		পা	শ
সু	দা	মা		বী			ম্ব
		রী		জ	ল	ন্ধ	র
বি	ন্ধ্যা	চ	ল		লি		
র			ব		তা	ম	স
জা	ঠা		কু			হি	
			শ	কু	নি	মা	মা

অক্টোবর যেমন ছিল পুজো, মানে দুর্গাপুজোর মাস, নভেম্বর কালীপুজোর বলে বলীয়ান। মা-কালী যেভাবে সারা বাংলায় পূজিত হন, সেভাবে অন্য কোথাও কালীপুজো হয় বলে মনে হয় না। এ সময়টা উত্তরভারতে হয় দীপাবলী উৎসব। বিজয়ী রাম, সীতা ও লক্ষণকে নিয়ে, রাবণকে পরাস্ত করে এ সময়ে অযোধ্যায় ফেরত এসেছিলেন। তাই উৎসবে মেতেছিল প্রজারা। কিন্তু কালীপুজোর মাহাত্ম্য আমাদের কাছে অন্য। মা কালী আমাদের জীবনের কতটা জুড়ে রয়েছেন সে নিয়ে পর্যালোচনা রয়েছে এবারের সংখ্যায়। মার পুজোর দিনটা আমার কাছে চিরস্মরণীয়। এই কালীপুজোর দিন প্রতিবছর বাবা আমাদের সঙ্গে বাজি পোড়াতেন। সে সময়ে সাউন্ড পলিউশন নিয়ে এতটা ভাবনা চিন্তা হতো না। তবুও আমরা যে পাড়ায় বড় হয়েছি, সেখানে অবাঙালির সংখ্যা বেশি, সেখানে একটি অলিখিত নিয়ম ছিল, বাজি পোড়ানো হবে কেবল রাত ন'টা অবধি। তারপর আর নয়। তাই সন্ধে হতে না হতেই শুরু হয়ে যেত, তারাবাজি, চড়কি, চকোলেট বোমার উৎপাত। কিন্তু ন'টার মধ্যে সব গুটিয়ে ফেলতে হতো। তারপর হতো ডিনার, আর রাতে বাবা নিয়ে বেরোতেন আমাদের ঠাকুর দেখাতে। কালীপুজোর রাতটা ছিল রাত জাগার জন্য। বছরে এই একটা দিন সারা রাত জাগতাম। ভোরে বাড়ি ফিরে সেই যে ঘুম, একেবারে বিকেলে ওঠা! এরপর রাতে আর ঘুম আসতে চাইতো না। ভাসানের পরদিন ভাইফোঁটা। সেই দিনটায় আমরা যেতাম আমাদের পিসির বাড়ি সন্ধেবেলায়। সেখানে পিসি যেমন বাবা-কাকা-জ্যাঠাদের ফোঁটা দিতেন, তেমনই তাঁদের ছেলেমেয়েরাও আসত পিসির বাড়িতেই। আমরা সব বোনেরা একসঙ্গে লাইন করে ফোঁটা দিতাম ভাইদের। তারপর চলত ডার্করুম, লুকোচুরি খেলা। অবশেষে খাওয়া, ভাত, মাংস, লুচি, বেগুনভাজা দই আর মিহিদানা। এখনও খাই অনেক জায়গায়, বিচিত্র স্বাদের খাবার, কিন্তু সেই ছোটবেলার খাওয়ার স্বাদ আজও অপরাজিত।

কালীপুজো এসে যাওয়া মানে শীতের আর বেশি দেরি নেই। সেটাও কিন্তু এক আনন্দ সংবাদ। আমাদের এই গরমের দেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি বাইরে কাজ করার জন্য আদর্শ। নেই ঘামের প্যাচপ্যাচানি, গরমের গা-জ্বালা। তবে হ্যাঁ বাতাসে আর্দ্রতার অভাবে যেমন ঘামের কবল থেকে ছুটি তেমনই আবার শুষ্কতায় ত্বকে খড়ি উঠতে থাকে। অবশ্য তার মোকাবিলার জন্য যেমন রয়েছে রান্নার তেল, তেমনই আবার বাজার চলতি লোশনও। একটু চেষ্টা করলেই নিজের শরীর মন আগামী শীতের জন্য এখন থেকেই তৈরি করে ফেলা যায়। আমি তো শীতকালটা পুরো জুতো মোজা পরি, পা পরিষ্কার রাখতে ও পায়ের ত্বক ভাল রাখতে। তাই নভেম্বর পরতে না পরতে শুরু হয়ে যায় ম্যাচিং জুতো মোজা পরা। আপনারাও শুরু করে দিন শীতের প্রস্তুতি। আর আমাদের জানান শীতে আমাদের কী করা উচিত আপনাদের জন্য।

সুদেষ্ণা রায়

সুবিধার গ্রাহক হতে চান

সুবিধা এখন মাসিক হল। বছরে ১২টি সংখ্যা!
আপনারা যদি নিয়মিত গ্রাহক হতে চান তাহলে নিচের কুপনটা ভরে সঙ্গে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন হিসাবে, মোট একশো টাকার একটি 'A/C Payee' চেক সহ আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। চেক হবে Eskag Pharma Pvt Ltd এই নামে।

১২টি সংখ্যা মাত্র ১০০ টাকায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে করুন সাশ্রয়

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....দূরভাষ.....

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে

অভিনয়

সু কা ন্ত গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

গেস্ট হাউসের বিশাল ড্রয়িং-এ উনি এখন নিদ্রাচ্ছন্ন। দীপ্তর কোলে মাথা রেখে টান টান হয়ে শুয়ে আছেন সোফায়। ওঁর কাঁচা পাকা চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে দীপ্ত। মোহন একটু দূরে মেঝেতে বসে সদ্য দিয়ে যাওয়া ইংরেজি খবরের কাগজটা ওলটাচ্ছে। দিল্লির কাগজ। কাল মোহনদের শো-এর খবরটা নিশ্চয়ই থাকবে। নাটকটা যেহেতু এই শহরেই মঞ্চস্থ হয়েছে।

না, কোনও পাতাতেই পাওয়া গেল না নিউজটা। নিচের ঠোঁট উলটে দীপ্তর দিকে তাকাল মোহন, ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলে খবর না বেরোনোর হতাশা। দীপ্ত পাত্তা দেয় না। ইয়ার্কির হাসি হাসে। চোখের ইশারায় কোলে শুয়ে থাকা অমলেশদাকে দেখায়। ইঙ্গিতটা ধরতে পারে মোহন। দীপ্ত একদিন বলেছিল, দলের যে কোনও কাজ করে দেব, সিনিয়রদের ব্যক্তিগত ফাইফরমাশ পর্যন্ত। গা টিপে দিতে বললে, তাও দেব। যে করে হোক নিজেকে অপরিহার্য করে তুলব দলের কাছে। এরকম নামী দলে একবার যখন ঢুকেছি, ছিটকে যাওয়ার কোনও সিন নেই।

অতএব দীপ্ত মোটামুটি লাইন ধরে নিয়েছে। এই মুহূর্তে দলের প্রধান ব্যক্তিত্ব মাথা তুলে দিয়েছেন ওর কোলে। দীপ্তর জন্য কষ্ট হয় মোহনের, অভিনয় ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে ওর। দলের ছোট বড় সকলেই সেটা জানে, বোঝে। শুধু দীপ্তই ধরতে পারে না।

অমলেশদা বোধহয় পুরোপুরি ঘুমিয়েই পড়লেন। মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে। এক মনে চুলে বিলি কেটে যাচ্ছে দীপ্ত। এই নৈকট্যের দৃশ্য দেখলে কে বলবে এই ট্যুরের গোটা ট্রেন জার্নিতে অমলেশদা এবং ওঁর স্ত্রী নন্দা রায় এসি টু টিয়ারে ট্র্যাভেল করেছেন। বাকিরা স্লিপার ক্লাস। মোহনরা সবচেয়ে জুনিয়র, স্লিপার ক্লাসে যেতেই পারে। অমলেশদার সমসাময়িক এবং নন্দাদির অনেক আগে থেকে দলের সদস্য, তাঁরাও মোহনদের সঙ্গে ট্র্যাভেল করেছেন। অথচ অমলেশদা কথায় কথায় বলেন, দলের নতুন পুরনো সকলেই সমান। ইকুয়ালিটি না থাকলে অভিনয়ে হারমনি তৈরি হয় না।

কল শো-এর জন্য রাত কাটাতে হলে অমলেশদা উদ্যোক্তাদের একটা অন্তত এসি রুমের ব্যবস্থা রাখতে বলেন। অমলেশদা, নন্দাদি থাকবেন সেখানে। এই বৈষম্য নিয়ে দলের পুরনো কোনও সদস্যকে অভিযোগ করতে দেখেনি মোহন। আগে

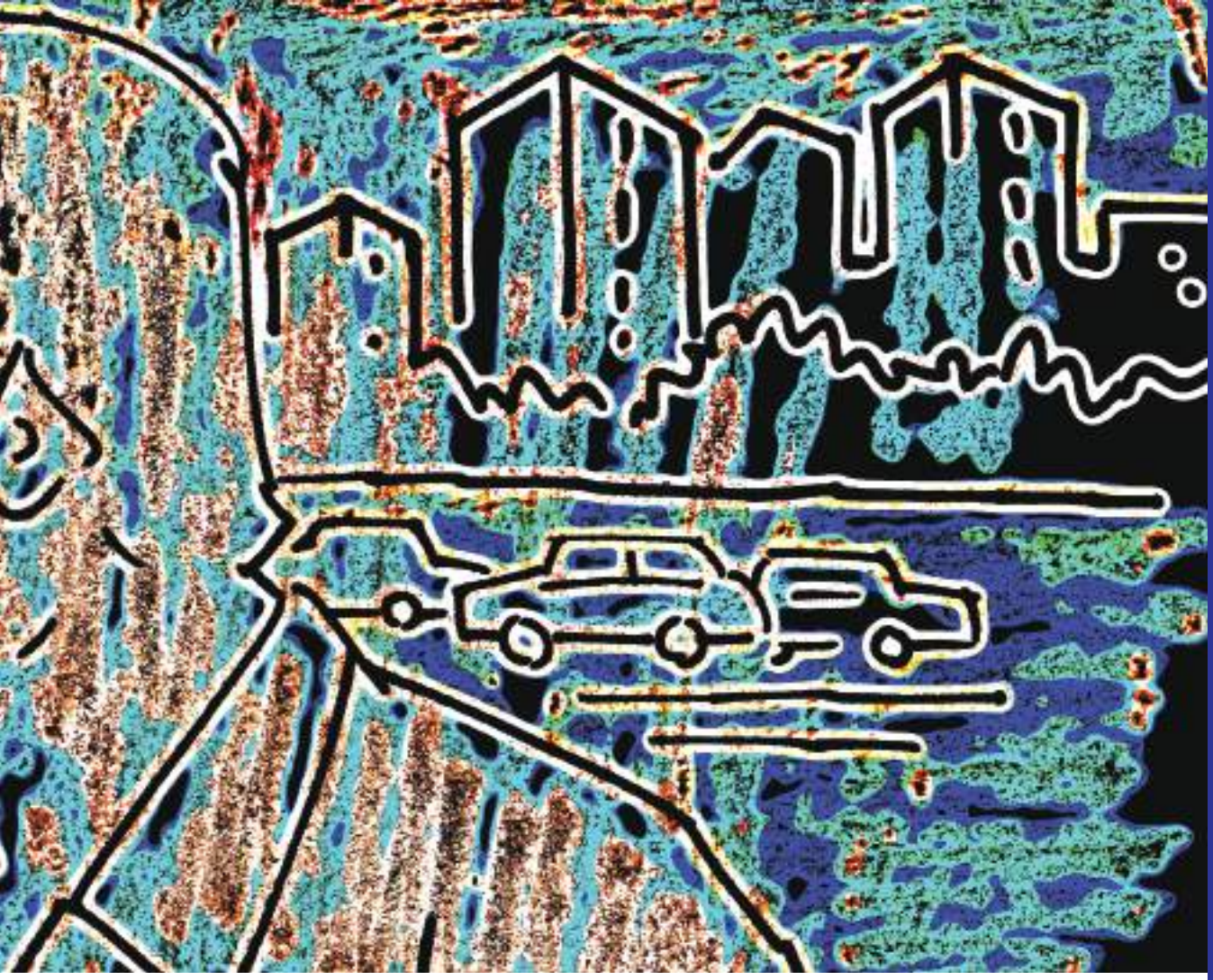

হয়তো কেউ কেউ নিশ্চয়ই করেছিল, তাঁরা দল থেকে বাদ পড়ে গেছেন। তাঁদের দেখার সৌভাগ্য হয়নি মোহনের।

এই বাড়তি সুবিধেটা পাওয়ার জন্য নন্দাদিকে একটু পরিশ্রম করতে হয়। ট্যুরে গেলেই একটা অসুস্থভাব ধরে রাখেন শরীরে। অমলেশদা পাশে পাশে থাকেন অ্যাটেন্ডেন্টের ভঙ্গিতে। রুম এবং জার্নি বাদ দিলে অমলেশদা কিন্তু দলের ছোটদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন বেশি। সারারাত এসি ঘরে কাটিয়ে এখন যেমন দীপ্তর সান্নিধ্য উপভোগ করছেন। ইয়াংরাই তো দলের ভবিষ্যৎ। তাদের কাছে গেলে, কৃতার্থ হয়। মনে মনে পুজো করে। পুরনোদের সে সব ঘোর কেটে গেছে। উদ্যমের অভাবে অন্য দলে যায় না। নিজেরাও দল গড়ার কথা ভাবে না। গ্রুপের অনুগত হয়ে অভিনয়ের ক্ষিধেটা মিটিয়ে নিচ্ছে।

জ্যোতিদা ঘরে ঢুকল হঠাৎ হাতে ক্যামেরা। অমলেশদা আর দীপ্তর অন্তরঙ্গতার ঝট করে একটা ছবি তুলে নিল। দীপ্তর মুখে কৃতজ্ঞতা আর লজ্জা মেশানো হাসি। জ্যোতিদা হাসি বিনিময় করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এবার মোহনের ঠোঁটে উদয় হল সেই বিষাক্ত হাসি। চোখাচোখি হতেই দীপ্তর খুশি উধাও। নামিয়ে নিয়েছে দৃষ্টি। মোহনের এই হাসিটা পরিচিত জনেদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে বহুবার। সাংঘাতিক ব্যঙ্গাত্মক, শ্লেষবহ এই হাসি। ইচ্ছে মতো হাসিটা হাসা যায় না। আয়নার সামনে অনেকবার ট্রাই নিয়েছে মোহন। তবু মনের চোখ দিয়ে মোহন দেখতে পায়, হাসিটা হাসলে কেমন দেখায় ওকে। ভন্ডামি দেখলেই এই হাসি ফুটে ওঠে মুখে। কিছুতেই আয়ত্তে থাকে না। এমনকী অমলেশদার সামনেও এই হাসি সে একদিন হেসে ফেলেছিল। সেই মুহূর্তে উনি অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে ভিতর ভিতর একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়, বাইরে থেকে যা সহজে টের পাওয়া যায় না।

মোহনরা কাল দিল্লি থেকে চলে যাবে। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ হয়ে দিল্লি এসেছিল। তিনটে নাটক দুজায়গাতেই হয়েছে। তিনটেই যান্ত্রিক সফল। হ্যাঁ, যান্ত্রিক। মোহন লক্ষ্য করছে একটি নাটক পর পর পাঁচবার অভিনীত হলেও দেখা যায় তফাৎ যৎসামান্য। তা হলে আর সিনেমার সঙ্গে পার্থক্য কী রইল? এদিকে অমলেশদা বলেন, নাটক সিনেমার চেয়ে অনেক মহৎ শিল্প। একটা জীবন্ত ব্যাপার। দর্শকরা উইথ রিঅ্যাকশন্ পার্টিসিপেট করেন নাটকের সঙ্গে। অন্য কোনও মিডিয়ামে এমনটা হয় না। বাস্তব কিন্তু উল্টোটা বলে। অন্তত মোহনদের গ্রুপে পরিচালকের নির্দেশের বাইরে গিয়ে খুব কম অভিনেতাই নিজেকে পাল্টানোর চেষ্টা করেন এবং তা এতই কিঞ্চিৎ, মোহনের মতো নিবিষ্ট দর্শক ছাড়া আর কারও চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ।

তিনটে নাটকের একটিতে মোহনের ছোট্ট একটা রোল আছে। সেটাতে প্রত্যেকবারই মোহন একটু করে পাল্টে নেয় নিজেকে। রোলটা এতই ছোট এবং কম গুরুত্বপূর্ণ যে দলের কেউ খেয়াল করে না। অমলেশদা, নন্দাদি, সোহরাবদা, জ্যোতিদা, শান্তাদি, মিলি... সকলের অভিনয় প্রতি শোতে একরকম। পরিচালক অমলেশদাও নিজের নির্দেশ অভিনয় করার সময় অমান্য করেন না। তবুও খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকের অভিনয়ে

কিন্তু ধীরে ধীরে বদল আসছে, অনিচ্ছাকৃতভাবেই আসছে। যেভাবে মানুষ বদলে যায়। এমনকী পৃথিবীর সমস্ত কিছুই পাল্টায়। অলক্ষ্যে। তা ভালর দিকে না খারাপ, বোঝার মতো বয়স, অভিজ্ঞতা কোনওটাই হয়নি মোহনের।

দিল্লিতে ভোর দেরিতে হলেও আলোর আলস্য কাটে তাড়াতাড়ি। মাত্র সাড়ে আটটাতেই বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। শহরটা থেকে সবে মাত্র শীত চলে গেছে। ফ্যান চালাতে হচ্ছে এখনই। এ ঘরেও মিহি শব্দে চলছে ফ্যান। মোহনরা আছে করলবাগের একটা গেস্ট হাউসে। চিত্তরঞ্জন পার্ক খুব দূরে নয়। সেখানে মোহনের দূরসম্পর্কের এক মাসির বাড়ি। মা বারবার করে বলেছিল, একবার অন্তত মাসির বাড়ি ঘুরে আসিস। তোকে সেই কত ছোট দেখেছে।

সাইজেই বড় হয়েছে মোহন, আর কিছুতে তো কিছু হয়নি। তবু যাওয়াই যেত। বড় কজনই বা হয়। কিন্তু সকাল থেকে কেমন একটা অলসতা ভর করেছে। দলের অনেকেই ঘুম থেকে উঠে সাইট সিইং এ বেরোল। কয়েকজন গত রাতেই তাজ দেখতে গেছে। মোহন কোথাও যায়নি। খবরের কাগজেও মন বসাতে পারল না। সোফায় অমলেশদা, দীপ্ত দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দীপ্তর হাতটা এখনও অমলেশদার মাথায়। ঘাড়টা সোফায় হেলে গেছে। ঘুমিয়ে পড়লেও চামচ প্লেট ছাড়েনি। পাশের ঘর থেকে জ্যোতিদা, শান্তাদির গলা ভেসে আসছে।

পেপারটা মেঝেতে ফেলে রেখে মোহন উঠে পড়ে। বারান্দায় দাঁড়াতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল রোদে। পাড়াটা খুবই নিশ্চুপ। রাস্তায় লোকজন কম। বেলেঘাটায় তাদের পাড়ায় এখন জোর ব্যস্ততা। রাস্তার কলে জটলা। কেউ বাজার সেরে ফিরছে, কেউবা বেরোচ্ছে ডিউটিতে। কাজের মেয়ে,বউরা এ বাড়ি ও বাড়ি দৌড়চ্ছে। সতেরো দিন হল মোহনরা বাইরে। কত ঝাঁ তকতকে জায়গায় ঘুরলো, এখন বেলেঘাটার বিবর্ণ মলিন বাড়িটা বড় টানছে। এই সময় দাদা অফিসের ভাত খেতে বসে। সামনে মা। বলে চলেছে, এটা খা, ওটা খা। ভাতটা পুরো মেখে নে।

রান্নাঘরের দোরগোড়ায় ভাবগম্ভীর মুখে বসে রয়েছে বেড়ালটা। যা হোক, তা হোক করে খেয়ে উঠে পড়ে দাদা। অফিসে দেরি হয়ে গেলেই ওর প্রাইভেট কম্পানির মালিকের মুখ বাড়ির বেড়ালটার মতোই হয়ে যায়।

দাদা বেরিয়ে গেলে মা এঁটো বাসন নিয়ে কুয়োপাড়ে যাবে। সেখানে দড়িতে হয়তো দাদার রঙ জ্বলা লুঙ্গি, বগলছেঁড়া টি শার্ট শুকোচ্ছে। দাদার যা মাইনে, অত খারাপ পোশাক পরার কথা নয়। কিন্তু বাড়ির চারজন ওর একার রোজগারের ওপর নির্ভরশীল। মা, বাবা, মোহন আর কলেজে পড়া বোন। মোহন যখনই নাটক টাটক ছেড়ে যে কোনও প্রাইভেট কম্পানির দু-তিন হাজারের চাকরির চেষ্টা করতে গেছে, দাদাই বারণ করেছে। বলেছে, কী দরকার ওসব জায়গায় চাকরি করার। সারাদিন খাটাবে, অ্যাক্টিং করার সময়ই পাবি না। তার থেকে ভাল নাটক চালিয়ে যা আর চাকরির পরীক্ষা দে। সরকারি চাকরি। প্রচুর সময় পাবি, নাটকটা জীবনে থেকে যাবে। বাড়ির দিক তো আমি সামলাচ্ছি।

মোহনের ছোটবেলায় ওদের পাড়ার ক্লাবে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে নাটক হত। তাতে দাদার মেন রোল। অসাধারণ অভিনয় করত দাদা। পাশের পাড়া থেকে শুরু করে অনেক দূর দূর থেকে লোকে নাটক দেখতে আসত। এক ডাকে দাদাকে চিনত সবাই। হাফপ্যান্ট পরা মোহন আর ওর বন্ধুরা মিলে বুকে ভলান্টিয়ারের ব্যাচ পরে হাতে কঞ্চি নিয়ে ভিড় সামলাত। নাটক শুরু হলেই মোহন ডিউটি ভুলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলের অভিনয় দেখত। দাদার কি ভয়েস ছিল! স্বরের ওঠানামায় কাঁটা দিত গায়ে।

নাটক শেষে দর্শকদের ভিড়ে মিশে যেত মোহন। কান পেতে থাকত, দাদার অভিনয় সম্বন্ধে কারা কী বলছে শুনত। প্রশংসা শুনে বুক ফুলে উঠত গর্বে। দাদার কাছেই নাটক শেখা শুরু। সকালবেলা দুই ভাই মিলে আবৃত্তি ছিল প্রায় রোজকার রুটিন।

অমলেশদা যখন দাপটের সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করেন, কখনও কখনও দাদা বলে ভ্রম হয়। এ কথা সে কাউকে বলেনি। যে সব সন্ধেয় অমলেশদা স্টেজে দাপিয়ে অভিনয় করছেন, ঠিক সেই সন্ধেতেই দাদা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার বাস ঝাঁপিয়ে ধরছে। এতেও এক ধরনের দাপট আছে। গরিমা নেই।

—কী রে, একা একা এখানে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস? শান্তাদি-র গলা। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মোহন লাজুক হেসে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ কিছুই ভাবছে না। শান্তাদি ঠাট্টার সুরে বলল, শিওর গার্লফ্রেন্ডের কথা ভাবছিস। কতদিন দেখা নেই! ফোনটোন করে তো নাকি?

শান্তাদির দিকে মুখ ফেরায় মোহন। বলে আমার আবার গার্লফ্রেন্ড! মেয়েদের কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! —কেন, গার্লফ্রেন্ড হবে না কেন? তুই কম কী সে?

কথা ঘুরিয়ে নেয় মোহন। বলে, যাই সেট ফেট বেঁধে কাজ এগিয়ে রাখি। কালই তো ফেরা।

বারান্দা ছেড়ে সেটের ঘরের দিকে এগোয় মোহন। শান্তাদিকে যে উত্তরটা দেওয়া হল না তা হল, যে মেয়ে আমাকে পছন্দ করবে, মনে করলে আরও হাজারটা ছেলেকে পছন্দ করতে পারে। আমার মধ্যে কী বিশেষ গুণ বা পরিচয় আছে, একটি মেয়ে তাতে আকৃষ্ট হবে, গর্ব বোধ করবে। আমি হচ্ছি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বিলো অ্যাভারেজ ছেলে।

সেটের ঘরে এসে হতোদ্যম হয়ে পড়ল মোহন। সব ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। এত কিছু সে একা কী করে সামলাবে? গেস্ট হাউসে দীপ্ত ছাড়া জুনিয়ার ব্যাচের একমাত্র মোহন আছে। সেট প্রপস গোছানোর দায়িত্ব ছোটদের। দীপ্ত সেঁটে গেছে অমলেশদার সঙ্গে। বাকিরা বেড়িয়ে টায়ার্ড হয়ে ফিরবে। আলটিমেটলি মোহনের ওপরেই চাপ পড়বে বেশি। এখন থেকে শুরু করে দিলে এক সঙ্গে লোডটা পড়বে না। সন্ধের দিকে জুনিয়ার ব্যাচ বেশ টেনশনে থাকবে। কাজ ভাল হবে না। আজ সন্ধেতেই সেই মিটিং, যেখানে সিদ্ধান্ত হবে মোহনদের ব্যাচের কজন স্থায়ীভাবে থেকে যাবে দলে। গত ছমাস আগে রীতিমতো ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কুড়িটা ছেলে মেয়ে, যার মধ্যে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এই দল নাট্যপ্রশিক্ষণের কোর্স শুরু হয়। প্রত্যেক বছরই ছ মাসের এই কোর্স দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিনিময়ে সরকারি গ্রান্ট পাওয়া যায়।

মোহনদের ব্যাচের ছ মাস অতিক্রান্ত। শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটজন ছেলে, একজন মেয়ে। নামী দলের আকর্ষণে আসে অনেকেই, খাটা খাটনির চোটে পালিয়ে যায়। কোর্স শেষে এই নজনের মধ্যে থেকে তিন থেকে চারজনকে দলের স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হবে। ন জনের পারফর্মেন্স বিচার হবে আজকের মিটিং-এ। ফলাফল ঘোষণা হবে কলকাতায় ফিরে।

মোহন মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে দলে কে কে থেকে যাবে। সে যে থাকছে না, সেটাও তার কাছে পরিষ্কার। কেন না, দলের কাছে সম্পদ হয়ে ওঠার মতো কোনও গুণাবলী তার নেই। যেমন দীপ্ত তো বলেইছে দলের জন্য যে কোনও কাজে রাজি। আত্মসম্মান বিক্রি করতেও। এরকম অনুগত কর্মীকে দল ছাড়বে কেন। অভিরূপ থাকবে তবলা বাজাতে পারে বলে। একজন বাজিয়েকে প্রযোজনায় ভীষণ দরকার হয়। রঞ্জনা থাকবে দলে অভিনেত্রী কম বলে। অভিনয়টা অবশ্য খারাপ করে না। আর

থাকবে বিকাশ। অসম্ভব খাটতে পারে। একাই ভারী ভারী সেট কাঁধে তুলে লোড করতে পারে লরিতে। বাকি পাঁচজন বাদ। মোহনের মতো অন্য চারজনও বুঝেছে সেটা, তাই শেষবার দলের খরচায় ঘুরে নিচ্ছে। দলে টিকে যাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা মোহনের ছিল। একটা নাটকের যে ছোট রোলটা সে করে, অভিনয়টা দেখে চরম খুঁত খুঁতে পরিচালক অমলেশদাও কোনওদিন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

দাদা একদিন মা আর বোনকে নিয়ে অ্যাকাডেমিতে মোহনের অভিনয় দেখতে এসেছিল। খুব সেজেছিল বোন। মায়ের পরণে নতুন শাড়ি। দাদা অনেকদিন পর পাজামা, পাঞ্জাবি। সেদিন অমলেশদার সঙ্গে বাড়ির তিনজনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মোহন। দাদা ছিল মা, বোনের পিছনে, সঙ্কোচে একটু আড়ষ্ট হয়ে। ওদের মুখে সরল আনন্দের হাসি। তিনজনকে পৃথিবীর ভাল দেখতেদের দলের মনে হচ্ছিল।

এবার কলকাতায় ফিরে মোহন মা, দাদাকে বলবে, ওরা আমায় বাদ দিয়ে দিল। কেন না, আমি পরিচালকের চুলে বিলি কাটতে পারি না, তবলা, হারমোনিয়াম, গান কিচ্ছু জানি না। আমি মহিলা নই আর প্রচুর পরিশ্রম করার মতো উপযুক্ত দেহ গঠন আমার নয়।

সেটগুলো অনেকটাই গুছিয়ে এনেছে মোহন। এ যেন জটিল এক ধাঁধার সমাধান। সব কিছুই টুকরো টুকরো। এটার অংশ ওটার সঙ্গে আবার উলটোটা। প্লাইউডের জানলা, জেলখানা, থাম, চেয়ার, টেবিল, র‍্যাক... এই থামটায় বন্দি হিসেবে বাঁধা থাকত মোহন, একটা ছাপ তৈরি হয়েছে। দাগটাতে হাত বোলায় মোহন, ওর অভিনয় সত্তার সাক্ষর।

তিনটে নাটকের মঞ্চ সজ্জা এই ঘরে। ঢোকার সময় ঘরটা আবছা অন্ধকার ছিল। এখন বেশ জ্বল জ্বলে লাগছে। যেন জ্বলে উঠেছে মঞ্চের আলো। ক্ষীণ থেকে ক্রমশ স্পষ্ট নানা ডায়লগ মোহনের কানে ভেসে আসতে থাকে। তিনটে ভিন্ন নাটকের ডায়লগ এক সঙ্গে। কখনও অমলেশদা, কখনওবা শান্তাদি, সোহরাবদা, জ্যোতিদা, রঞ্জনা, শেখরদার অভিনীত চরিত্রের কণ্ঠস্বর পাক খেতে থাকে ঘরে। প্রত্যেককে নিখুঁতভাবে আলাদা করে চিনতে পারে মোহন। কারণ, সে কখনও ফাঁকি দেয়নি। সকলের অভিনয় মন দিয়ে লক্ষ করেছে। সব চরিত্রের ডায়লগ মুখস্থ। এই ঘরে যেন তিনটে নাটক এক সঙ্গে চলতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে একটু কান পাতলে মোহন শুনতে পায় দাদার অভিনীত একটা নাটকের অংশ। স্পষ্ট কানে আসছে মাইক বাহিত দাদার গলা। ওপর থেকে ঝোলানো মাউথপিস গুলো ক্যাচ করে নিচ্ছে মাঠের হাওয়ার শব্দ। নিজের ক্ষমতা নিংড়ে অভিনয় করে যাচ্ছে দাদা। গলা চলে যাচ্ছে দূরের দূরের পাড়ায়। কিন্তু দাদার শিল্পীসত্তা কোথাও পৌঁছোতে পারল না।

সেটের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মোহন। দরজা ভিজিয়ে দেয়। ওই ঘরে এখন চারটে নাটক একসঙ্গে অভিনীত হয়ে চলেছে।

দুই

সন্ধে। মিটিং বসে গেছে। বড়রা সকলেই আছে গেস্ট হাউসের ড্রয়িং-এ। দরজা বন্ধ। মোহন বেরিয়ে এল রাস্তায়। একটু দূরে দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে দীপ্ত। মোহন পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। দীপ্তর কাঁধে হাত রাখে। এই আচরণের মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীপ্তর সঙ্গে নেই। স্বাভাবিক ভাবেই একটু অবাক হয়ে নিজেকে সামলে নিল দীপ্ত। সহজ গলায় বলল, সিগারেট খাবি?

—খাওয়া।

সিগারেট ধরিয়ে গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল দুজনে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে যাচ্ছে। দীপ্ত নিজের থেকেই বলতে থাকে, তোর মধ্যে ডিপ্লোম্যাসির খুব অভাব। একটু ট্যাক্টফুল হওয়া উচিত ছিল। তোর দলে থাকার সম্ভাবনা পঞ্চাশ পঞ্চাশ হয়ে গেছে। কোর্স চলাকালীন পারফর্মেন্স যথেষ্ঠ ভাল দিয়েছিস। এদিকে আবার মাঝে মাঝেই চটিয়েছিস সিনিয়ারদের। এই যেমন শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পথে তুই বলতে লাগলি, জুনিয়াররাই কেন সব সময় বাসের পিছনের সিটে বসবে! ঝাঁকুনি খাওয়াটাও কি কোর্সের ভিতরে পড়ে? কথাগুলো নিজেদের মধ্যে বললেও, যথেষ্ঠ, গলা তুলে বলেছিলি। বড়দের কানে সবই গেছে। তারপর আসানসোলে যে কান্ডটা করলি... মোহন স্পষ্ট মনে করতে পারে ঘটনাটা, বড়দের জন্য সংরক্ষিত পরিচ্ছন্ন বাথরুম-পায়খানায় ভোরবেলায় শ্রীমন্ত চুপি চুপি সারতে গিয়েছিল। সেই সময় সিনিয়ার সুপ্রকাশদা বাথরুমে ঢোকার মুখে শ্রীমন্তকে ধরে ফেলে। কুকুর, বেড়াল তাড়ানোর মতো আচরণ করে শ্রীমন্তর সঙ্গে। বাথরুমে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। মোহন পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করে। জুনিয়রদের জন্য বাইরে যে পায়খানাটা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সেদিকে তাকানোই যায় না। ব্যবহার করা দূরের কথা। নিরুপায় হয়েই মোহনরা দুদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছিল। শুধু শ্রীমন্ত পারেনি। বাগবাজারের অভিজাত বাড়ির ছেলে। টাওয়েল পরা ভ্যাবাচাকা খাওয়া শ্রীমন্তকে দেখে মোহন আর স্থির থাকতে পারেনি। ছিটকে এসে শ্রীমন্তকে ধরে ওই অবস্থাতেই অমলেশদার সামনে হাজির করে এবং ঘটনার পুরো বিবরণ দেয়।

অমলেশ তখন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন। মন দিয়ে মোহনের কথা শুনলেন। তারপর শান্ত ভাবে উঠে গেলেন বাইরে। ঝাঁটা-মগ রাখা ছিল দাওয়ায়, তুলে নিয়ে জুনিয়ারদের টয়লেটের দিকে এগোতে থাকেন, ইয়াং ব্যাচের সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিল ঝাঁটা মগ।

উনি জানতেন এমনটাই হবে। কিছুক্ষণ অ্যাক্টিং করলেন এই বলে, না না, দাও না। আমি করে দিচ্ছি। তোমরা হেল্প করো।

জুনিয়াররা শুনল না। ঝাঁটা মগ নিয়ে চলে গেল পায়খানা ঘরটা পরিষ্কার করতে। গোটা প্রহসনে একমাত্র মোহন ছিল নির্বাক দর্শক। সদ্য মহান হয়ে ওঠা অমলেশদা যখন ফিরে আসছেন ঘরে, মোহনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়, ততক্ষণে মোহনের ঠোঁটে সেই বিষাক্ত হাসিটার উদয় হয়েছে। কিছুতেই হাসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না মোহন। অমলেশদার ভ্রূ জোড়া পরস্পরকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল। ওঁর মুখে ফুটে উঠেছিল চরম বিরক্তি। দ্রুত পায়ে ঢুকে গিয়েছিলেন ঘরে। তারপর থেকে আর কখনওই মোহনের সঙ্গে একাকী কথা বলেননি।

হাঁটতে হাঁটতে মোহন, দীপ্ত অনেকদূর চলে এসেছে। টানা চওড়া রাস্তা চলে গেছে আরও অনেক দূর। নির্দিষ্ট দূরত্বে ধবধবে আলোর স্ট্রিট ল্যাম্প। মোহন জানে এই আলোর প্রাচুর্য বেশি দূর যায়নি। কলকাতার কয়েকটা বড় থিয়েটার হলের মতোই এর গন্ডি। আলো ফুরোবে অচিরেই, রাস্তা চলতেই থাকবে। যেভাবে নাটকের ধারা চলতেই থাকে গ্রাম মফসসলের মধ্যে দিয়ে। জেনারেটরের শব্দ সহ আলো, মাইকের কর্কশ আওয়াজ নিয়ে কোনও না কোনও গ্রামের মাঠে এই মুহূর্তে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। দারিদ্রের সঙ্গে নিত্যকার লড়াই ভুলে কলাকুশলী, দর্শকরা মেতে উঠেছে শিল্পের অপার আনন্দে।

মোহন পাশে হাঁটতে থাকা দীপ্তকে বলে, কলকাতায় ফিরে কোথাও বেড়াতে যাই চ। সারাক্ষণ নাটক, দল আর ভাল্লাগে না।

এখানে তো প্রায় বেড়াতেই এসেছি। অনেকেই তো ঘুরতে গেল দিল্লি। যেতেই পারতিস তুই।

এভাবে বুড়ি ছোঁয়াকে বেড়ানো বলে না। চল না কদিন গ্রামে গিয়ে থাকি। কোনও একটা গ্রামে তোর দেশের বাড়ি বলেছিলিস না...

ফিরে গিয়ে তো দলের প্রচুর কাজ থাকবে। তোরা যদি আবার দলে না থাকিস, হিউজ চাপ পড়ে যাবে আমার উপর।

যদি কেন বলছিস? রেজাল্ট তো তুই জানিস।

মোহনের কথায় থতমত খায় দীপ্ত। বলে, বিশ্বাস কর, আমি কিছু জানি না। আন্দাজ থেকেই যা বলার বলছি।

মোহনের ঠোঁটে অনিবার্য ভাবে সেই হাসিটা ফিরে আসে। দীপ্ত হাসিটাকে লক্ষ করে চোখ নামিয়ে নেয়। বলে, তুই ওরকম বিচ্ছিরিভাবে হাসিস কেন বল তো! কেমন একটা সবজান্তা ভাব। কী মনে করিস নিজেকে।

মোহন নিজেকে কিছুই মনে করে না। শুধু হাসিটাই আয়ত্তে থাকে না তার। বড্ড বেয়ারা।

তিন

মোহনরা এখন কালকা মেলে। কলকাতা ফিরছে। মিটিঙের পর থেকে মোহন লক্ষ করছে ওকে এবং আর যাদের বাদ পড়ে যাওয়ার কথা, তাদের বড়রা এবং তার ঠিক পরের ব্যাচ এড়িয়ে থাকছে কৌশলে। আচরণটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। তবু কেন জানি মোহন ঠিক স্থিতধী হতে পারছে না। অস্থির হয়ে আছে মন। দলে যারা মাঝের ব্যাচ অর্থাৎ গত বছর কি তার আগের বছরগুলোয় কোর্সের মাধ্যমে দলে স্থায়ী হয়েছে, তাদের মধ্যে শুভাদা, বিপুলদা, চৈতিদি... সরাসরি মোহনদের ওয়ার্কশপে ক্লাস নিত। এরা সকলেই মোহনের পারফর্মেন্সে উচ্ছ্বসিত ছিল। তাদের সঙ্গে পার্সোনাল একটা রিলেশন তৈরি হয়েছিল মোহনের। শুভাদা গ্রুপের হোল টাইমার। বাড়ি বনগাঁয়। হোটেলে খায়, রিহার্সাল রুমে শোয়। মোহনকে একদিন বলেছিল, তোদের বাড়ি একদিন খেতে যাব। কত দিন বাড়ির রান্না খাইনি।

মোহন সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ওর মা দারুণ রাঁধে। শুভাদা দলের ছেলেদের কাছে এসে মায়ের রান্নার প্রশংসা করবে।

যাওয়া হয়ে ওঠেনি শুভাদার। এই যাব, সেই যাব হয়ে আছে। হুট করে কোনওদিন হয়তো চলেও আসত। কিন্তু মিটিঙের পর সেই সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। চুপচাপ হয়ে গেছে শুভাদাও। সকলকেই পর্যায়ক্রমে লক্ষ করছে মোহন। কেউ ওর চোখে চোখ রাখছে না।

চার

বাড়ি ফিরে মিটিঙের প্রসঙ্গ তোলেনি মোহন। এতদিন পর ফিরেছে, তাতেই মা কী খুশি! যেন বিলেত ঘুরে এল ছেলে। দাদা 'শো' কেমন হল, জানতে চাইলে মোহন শুধু ভাল বলে এড়িয়ে গেছে। চুপচাপ থেকেছে কদিন। কাজের কাজ একটাই করেছে পাড়ার নিভু নিভু নাটকের দলটা, যা মোহন আর কয়েকজন বন্ধু মিলে শুরু করেছিল, তাদের সঙ্গে একটা মিটিং করে, কী করে দলটাকে আবার চাঙ্গা করা যায়! মোহন অনেক দায়িত্ব নেয়। বন্ধুরা তার কথা গুরুত্ব সহকারে শোনে। কারণ, সে এখন নামী দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

ধীরে ধীরে মনটা বসে এসেছে মোহনের। এখন অনেকটাই সুস্থির। মোহন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তাকে যদি নামী দলে রাখতে চাওয়াও হয়, সে থাকবে না। উপেক্ষা, অপমান সহ্য করেছে অনেক।

আজ সন্ধেয় সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান। কোর্স শেষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। দলে যারা থেকে যাবে, নাম ঘোষণা হবে তাদের। মোহনের নাম ঘোষণা হোক বা না হোক,

সত্যিকারের মার সহ্য না করতে পেরে ডায়লগটা বলে ফেলে মোহন। নিজের কানেই টের পায় একদম ঠিকঠাক বলা হয়েছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে ছিল তার। দাদা ভাঙা মাস্তুলের মতো বিধ্বস্ত হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। বলে, পরের সিন শুরু করো।

সকলের অনুমতি নিয়ে মঞ্চে কিছু বলতে চাইবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির কথা। মোহন একে একে সব বলবে, মনের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত ক্ষোভের কথা। মুখোশ খসে পড়বে দলের ভণ্ডগুলোর। তারা আপশোস করবে, আগে জানলে মুখোশের দড়িটা বাড়ি থেকে টাইট করে বেঁধে আসতাম। সব শেষে মোহন এটাই প্রমাণ করবে যে, এই কোর্সের পরিচালক মণ্ডলী তথা এই দলটি নির্দয়, নিষ্ঠুর, সুবিধালোভী, জঘন্যতম একটি প্রাইভেট কোম্পানির কাছে আদর্শ। অসৎ এনজিও এই দলের সামনে এসে লজ্জায় মুখ লুকোবে। গ্রুপ থিয়েটারের নামে এরা সবাই নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।... হয়তো সুর এতটা চড়াতে পারবে না মোহন। সকলে বড় বড় চোখ করে দেখবে। মাঝপথে হয়তো জোর করে বলা থামিয়ে দেবে। তবু যতটা পারে বলবেই মোহন। এর আগে হয়তো দলকে এরকম একক প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়নি। অভিজ্ঞতাটা ছ্যাঁকা লাগা দাগের মতো দলের শরীরে রয়ে যাবে অনেকদিন। মোহন জানে তার কথাগুলো বলার জন্য কী প্রচন্ড মানসিক শক্তি দরকার। কদিন ধরেই এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বক্তব্যের একটা স্ক্রিপ্টও তৈরি করে ফেলেছিল মনে মনে। আজ ঘুম থেকে উঠে খেয়াল করল সমস্ত ডায়লগ মুখস্থ হয়ে গেছে। মনে মনে নানা এক্সপ্রেশনে সেই সংলাপগুলোই আওড়ে যাচ্ছে।

পাঁচ

মোহন এখন বাসে। সমাবর্তন শুরু হতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাবে দলের বিশাল মহড়াকক্ষে। সময় যত এগিয়ে আসছে, একটু বুঝি নার্ভাস হয়ে পড়ছে মোহন। অত বড় বড় ব্যক্তিত্বদের সামনে পারবে তো সব কথা গুছিয়ে বলতে? ব্যক্তিত্বের মুখোশগুলো তাকে ভয় পাইয়ে দেবে না তো? চোখ বুজে হলেও, সম্পূর্ণ বক্তব্য সে রাখবেই। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই কবে একবার দাদার নির্দেশনায় একটা নাটকের রিহার্সাল চলছিল। সিচুয়েশনটা ছিল, একজন পুলিশ অফিসার সেলের মধ্যে

প্রচন্ড মারধোর করছে একটি ছেলেকে। ছেলেটি মার খেতে খেতে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ পর মার যখন অসহ্য পর্যায়ে, ছেলেটি বলে উঠছে, স্যার আর না, এবার মরে যাব। মরে যাব। মা গো-ও-ও... মোহন কিছুতেই পারছিল না ডায়লগটা ঠিকমতো ডেলিভারি করতে। ওর স্বরে মার খাওয়ার কোনও ছাপ ছিল না। বারবার চেষ্টা করেও ফেল করছিল মোহন। দাদা বহুবার দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও। সামনে বসে থাকা দাদা একসময় ছিটকে উঠে এল। মোহন জানে না কী হতে চলেছে। পুলিশ অফিসার চরিত্রটিকে সরিয়ে দিয়ে দাদা সত্যিকারের, একেবারে পাগলের মতো মারতে শুরু করেছিল মোহনকে। প্রথমটায় হকচকিয়ে যায় মোহন। এলোপাথাড়ি মার খেতে থাকে। দাদা বলে যায়, বল, ডায়লগ বল। বল বলছি। শালা নাটক করতে এসেছে। শখ!

সত্যিকারের মার সহ্য না করতে পেরে ডায়লগটা বলে ফেলে মোহন। নিজের কানেই টের পায় একদম ঠিকঠাক বলা হয়েছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে ছিল তার। দাদা ভাঙা মাস্তুলের মতো বিধ্বস্ত হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। বলে, পরের সিন শুরু করো।

সেই রাতে দাদা অনেকক্ষণ মোহনের সঙ্গে কথা বলেছিল ছাদে পায়চারি করতে করতে। বলেছিল, জানিস মোহন, পৃথিবীতে তো প্রচুর নাটক লেখা হয়েছে। সেখানে কত চরিত্র। এরা কিন্তু কেউ আকাশ থেকে পড়া বা অবাস্তব নয়। আমাদের সমাজেই অবস্থান করে বা করত। এদের অক্ষমতা, নিজেদের মনের কথা প্রকাশ্যে, পাঁচজনের সামনে না বলতে পারা, ওদের হয়ে কাজটা অভিনেতারা করে। তাই ওইসব মানুষের না বলতে পারা সত্তা অদৃশ্যভাবে ঘুর ঘুর করে অভিনেতার চারপাশে। তাদের যদি তুই ঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারিস, রাতে পৃথিবী যখন শান্ত হয়ে যায়, কান পাতিস। ঠিক তাদের কান্না শুনতে পাবি।

মোহনের স্টপেজ এসে গেছে। নেমে পড়ে বাস থেকে। নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। বেশ কনফিডেন্ট লাগছে। ওদের রিহার্সাল রুমে ঢোকার আগে ফুটপাতে একটা পানের দোকান আছে। বিশাল আয়না লাগানো দোকানটাতে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নিজের অর্ধেকটার বেশিই দেখা যায়। আয়নাটাতে মোহন নিজেকে মেপে নেয়, বেশ চোখা লাগছে।

সভা সবে শুরু হয়েছে। এই গ্রুপ পাংচুয়ালিটিতে খুব বিশ্বাসী। এসব মোড়কই দলটার আভিজাত্য বাড়িয়েছে। ভিতরে ফাঁপা আদর্শ। অমলেশদা প্রারম্ভিক ভাষণ দিচ্ছেন। মোহন মাথা নিচু করে গুটি গুটি পায়ে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে, যেখান থেকে কাউকে না ডিঙিয়ে, না মারিয়ে সরাসরি বক্তৃতা এরিয়ায় চলে যাওয়া যায়। অমলেশদা তাঁর গমগমে কণ্ঠে বিনয় মিশিয়ে বলে চলেছেন। সবাই মোহিত হয়ে শুনছে। এই কোর্সের বাতিল ছেলেদের কাছে এটা হয়তো লাইফ টাইম এক্সপেরিয়েন্স। অমলেশদাকে এত কাছ থেকে পাওয়া এবং শোনা। এদের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অভিনয় ছেড়ে দেবে। বাকি জীবনে আজকের অভিজ্ঞতাটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে শেয়ার করবে অন্যদের সঙ্গে। অমলেশদা গ্রুপ থিয়েটারে এখনই প্রবাদ প্রতিম। মাঝে মাঝে, সিনেমায় অভিনয় করে সেই মাধ্যমকে কৃতার্থ করেন। উনি আরও বড় হবেন। আকাশে ঠুকে যাবে মাথা। মূল পর্বে পৌঁছে গেল সভা। বক্তৃতার ধরন পালটে ফেলে জরুরি ঘোষণার মতো অমলেশদা বলতে থাকলেন, এবারের ওয়ার্কশপ থেকে দল চার জনকে স্থায়ীভাবে পেতে চায়। আর বাকিদের কাছে আমরা এতদিনকার আন্তরিক মেলামেশায় এটা আশা করতেই পারি যে, দলের প্রয়োজনে তাদের ডাকলে নিশ্চয়ই সাড়া পাব। সে বিশ্বাস আমার আছে। এবার বলি সেই চারজনের নাম। যারা দলে স্থায়ী সদস্যপদ পাচ্ছে, দীপ্ত হালদার, রঞ্জনা সাহা, অভিরূপ দে, মোহন সরকার।

হকচকিয়ে যায় মোহন, নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না, ঠিক শুনল কি? টান টান হয়ে থাকা সমস্ত স্নায়ু দ্রুত শিথিল হয়ে যেতে থাকে। মোহন আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে গুছিয়ে নিতে। যা যা ঠিক করে এসেছিল বলবে, আজ সে বলবেই। সে তো সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে, দলে রাখুক, চায় না রাখুক, অভিযোগগুলো জানানো ভীষণ দরকার।

মোহন সামনে রসট্রামের দিকে তাকাল। অমলেশদা সরাসরি তার দিকেই চেয়ে আছেন। ওঁর চোখের ভাষা পড়তে পারে না মোহন, উনি কি বিদ্রুপ করে বলছেন, হিসেব মিলল না তো! নাকি ওই দৃষ্টি কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশীর?

দীপ্ত এসে মোহনের কাঁধে হাত রাখে। রোগা দীপ্তর কী ভারী হাত! নুইয়ে যায় মোহন। এবং টের পায় ভিতরের সেই একরোখা ভাবটা বরফের মতো গলতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে জ্যোতিদার ডাকে কোর্সের শিক্ষার্থীরা একে একে এগিয়ে যাচ্ছে সার্টিফিকেট নিতে। কারুর কিছু বলার থাকলে, বলতে পারে। সময় দুমিনিট। এমন একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কেউ কিছু বলছে, কেউবা কিছু না। হাবেভাবে সকলেই নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। মোহনের রেডি করা ডায়লগ এলোমেলো হয়ে গেছে সব। কিছুতেই নিজেকে গুছোতে পারছে না। এখন মোহনের একটা পরিচয় তৈরি হয়েছে। এই পরিচয়ের বয়স মাত্র পনেরো মিনিট। ও এখন বাংলা তথা ভারতের নাম করা গ্রুপ থিয়েটারের স্বীকৃত সদস্য এবং অভিনেতা। এই সদ্যোজাত পরিচয়ের ভার এতটাই, এটাকে সরিয়ে মোহন নিজের কথাগুলো বলে উঠতে পারছে না। সেই শক্তি তার নেই।

মোহনের নাম ঘোষণা হল। এগিয়ে যায় সে গলা চেপে বসে গেছে। একটা কথাও বেরোবে না তার মুখ দিয়ে। রিহার্সালে দাদার মারের কথা মনে করে। কোনও লাভ হয় না। ঘোষিত মর্যাদা আর অমলেশদার হাত থেকে শংসাপত্র নিয়ে সৌজন্যের হাসি বিনিময় করে সরে আসে পোডিয়াম থেকে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই সবার অলক্ষে রিহার্সাল রুম থেকে বেরিয়ে আসে মোহন। ফুটপাত ধরে এগোতেই অভ্যেসবশত চোখ যায় পানের দোকানের আয়নার দিকে। চমকে ওঠে। একী দেখছে সে! নিশ্চিত হওয়ার জন্য এগিয়ে যায় পানের দোকানের আয়নার কাছাকাছি, ওর ঠোঁটে সেই বিষাক্ত হাসিটা সেঁটে আছে। যেটা এর আগে কখনও অনেক চেষ্টা করেও ইচ্ছে মতো আয়নার সামনে হাসতে পারেনি। কোনও ভন্ডামি ঘটতে দেখলেই এই হাসিটা অজান্তেই অমোঘভাবে চলে আসত ওর ঠোঁটে। কিন্তু এখন কেন এল?

আয়না থেকে মুখ সরিয়ে নেয় মোহন। হাত দিয়ে ঠোঁট মোছে ঘষে ঘষে। বাসে মুখ আড়াল করে বসে থাকে। মাঝে মাঝেই ঠোঁট ঘষে হাসিটা মুছতে চায়। টের পায় মোছা যাচ্ছে না।

ছয়

রাতে মোহনের ঘুম আসছে না। অন্ধকারে চোখ চেয়ে শুয়ে আছে। সে জানে তিল জরুলের মতো এখনও ওই হাসিটা তার ঠোঁটে লেগে রয়েছে। ঘুম বোধহয় আজ আর আসবে না। কীসের যেন শব্দ পায়। কান পাতে। চাপা কান্নার শব্দ। দাদা এই কান্নার কথাই বলেছিল, নিজের কথা বলতে না পারা চরিত্রের কথা। ওদের অদৃশ্য সত্তা অভিনেতার কাছে এসে কাঁদে।... খুব কাছ থেকে আসছে শব্দটা। আর একটু খেয়াল করতেই মোহন ধরতে পারে গোঙানিটা বেরিয়ে আসছে ওর গলা দিয়েই।

ভাই ফোঁটার ভোজ

পোলাও মাংস তো বটেই, সেই সঙ্গে ভাই বা দাদাকে আর কী কী খাওয়াতে পারেন, তাই জানিয়েছেন **ইন্দ্রানী গুহ**

পোলাও

কী কী লাগবে

গোবিন্দ ভোগ চাল : ১/২ কেজি ; গাওয়া ঘি : ১০০ গ্রাম ; গরম মশলা (এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ) : ১০ গ্রাম ; কিশমিশ : ৫০ গ্রাম ; কাজুবাদাম : ১০০ গ্রাম ; তেজপাতা : ৫/৬টা ; আদা বাটা : ২৫ গ্রাম ; জায়ফল ও জৈয়িত্রী : সামান্য ; হলুদ গুঁড়ো : ২ চা-চামচ ; চিনি : স্বাদমতো ; নুন : আন্দাজমতো।

কী করে করবেন

চালটা ভাল করে ধুয়ে, শুকিয়ে নিন। একটা পাত্রে ১ লিটার মতো জল ফুটিয়ে রাখুন। কড়াতে সামান্য ঘি দিয়ে, তাতে তেজপাতা, থেতো করা গরম মশলা, থেতো করা জায়ফল, জৈয়িত্রী ও আদাবাটা দিন। এর মধ্যে শুকনো চালটা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করুন, যতক্ষণ চালটা সাদা না হয়। সাদা হলে ফুটনো জল দিয়ে দিন। ওই জলে হলুদ গুঁড়ো, কাজুবাদাম, কিশমিশ ও নুন দিন। আঁচ কমিয়ে দিন। জল মরে এলে, তাতে স্বাদমতো চিনি, ও বাদবাকি সবটা ঘি দিয়ে, পাত্রটা ঝাঁকিয়ে নিন। যাতে সব জায়গায় চিনি ও ঘি-টা ছড়িয়ে যায়। পোলাও রান্না শেষ। চালটা একটু শক্ত মনে হলেও চিন্তার কোনও কারণ নেই। ঢেকে রাখলেই চালটা সুসিদ্ধ হবে এবং একটা চালের গায়ে, আরেকটা চাল লাগবে না, ঝরঝরে থাকবে।

সোনামুগ ডাল

কী কী লাগবে

সোনা মুগ ডাল : ২০০ গ্রাম ; মটরশুঁটি (দানা) : ১০০ গ্রাম ; নারকোল কোরা : ৪ চা-চামচ ; কিশমিশ : ২০ গ্রাম ; কাঁচা লঙ্কা : ৬/৭টা ; শুকনো লঙ্কা : ২/৩টে ; তেজপাতা : ২টো ; আদাবাটা : ২ চা-চামচ ; জিরে গুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; নুন : আন্দাজমতো ; চিনি : স্বাদমতো ; টোম্যাটো : ২টো (মাঝারি) ; ঘি : ৩ চা-চামচ।

কী করে করবেন

প্রথমে মুগডালটা সোনালি রঙের করে, শুকনো কড়াতে ভেজে নিন। ওই ডালটা একটু জল দিয়ে প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করুন। খেয়াল রাখুন ডালটা যেন পুরো গলে না যায়। কড়াতে ঘি দিয়ে শুকনো লঙ্কা ও তেজপাতা সম্বার দিন। ১ চা-চামচ সাদা জিরে দিন। লঙ্কা ও জিরে ভাজা হলে, তাতে টোম্যাটোর টুকরো, আদাবাটা, জিরে গুঁড়ো, নারকোল কোরা, মটরশুটি দিয়ে, একটু নাড়াচাড়া করুন। সেদ্ধ ডাল ঢেলে দিন। ওপরে কাঁচা লঙ্কা চিরে ছড়িয়ে তাতে আন্দাজ মতো নুন ও চিনি দিয়ে, ফুটে উঠলে ২/১ মিনিট পর নামিয়ে ফেলুন।

মাছ ভাজা

কী কী লাগবে

কাতলা মাছের লম্বা লম্বা পেটি : ৬ টুকরো (৪০০ গ্রাম) ; আদা বাটা : ১ চামচ ; পেঁয়াজ বাটা : ২ চা-চামচ ; রসুন বাটা : ১ চা-চামচ ; কাঁচা লঙ্কা বাটা : ১ চা-চামচ ; গোলমরিচের গুড়ো : ১/২ চা-চামচ ; ময়দা : ৩ টেবিল চামচ ; নুন : আন্দাজ মতো ; তেল : ১০০ গ্রাম ; পাতিলেবুর রস : ২ চা-চামচ।

কী করে করবেন

মাছের টুকরোগুলো ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। ওই মাছে, আদাবাটা, পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, গোলমরিচের গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস ও নুন মাখিয়ে আধঘণ্টা বা এক ঘন্টা রেখে দিন।

ময়দায় অল্প তেলের ময়ান দিয়ে জল দিয়ে একটা গোলা করুন। এমন পরিমাণ জল দিতে হবে, যাতে গোলাটা বেশি পাতলা না হয়। কড়াতে সবটা তেল দিয়ে, মশলা সমেত মাছের টুকরোগুলো, ময়দার গোলায় চুবিয়ে, ডুবো তেলে ভেজে তুলুন। খাবার পাতে গরম গরম মাছ-ভাজা তুলে দিন। মাছের পেটিতে কাঁটা কম থাকে বলে মাছের পেটি দিয়েই এই ভাজা করা ভাল। মাছের কাঁটা বাছতে গেলে, খাওয়ার আনন্দই নষ্ট হয়ে যায়।

চিতল মাছের কালিয়া

কী কী লাগবে

চিতলমাছের বড় বড় পেটি : ৬টি ; পেঁয়াজ বাটা : ৪ চা-চামচ ; আদা বাটা : ২চা-চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; লঙ্কাগুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; টক দই : ৫০ গ্রাম ; গরম মশলার গুঁড়ো : ১/২ চা-চামচ ; নুন : আন্দাজমতো ; চিনি : স্বাদমতো ; ঘি : ২ চা-চামচ ; তেল : ৭৫ গ্রাম ; কুচনো পেঁয়াজ : ১ টা (ছোট) ; তেজ পাতা : ২ টি।

কী করে করবেন

মাছের টুকরোগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে, নুন, হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলুন। বাদবাকি তেলটা কড়াতে দিন। তেল গরম হলে তাতে কুচোনো পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে, আদা বাটা, পেঁয়াজবাটা, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুড়ো, দই ও নুন দিয়ে দিন। ভাজা-ভাজা গন্ধ বের হলে এবং মশলা থেকে তেল বেরিয়ে এলে, তাতে মাছগুলো সাজিয়ে, জল দিন। জল এমন দিতে হবে, যাতে মাছ সেদ্ধ হয়, কিন্তু মাখা-মাখা ঝোল থাকে। নামানোর আগে ঘি, গরম মশলার গুঁড়ো, চিনি এবং ৪/৫টা আস্ত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, আঁচ থেকে নামিয়ে পাত্রে সাজিয়ে দিন। ইচ্ছে হলে এতে ১৪/১৫টা কিশমিশও ছড়িয়ে দিতে পারেন। তাতে স্বাদ একটু ভাল বই, কম হবে না।

কচি পাঁঠার কষা মাংস

কী কী লাগবে

পাঁঠার মাংস : ১কেজি ; পেঁয়াজ কুচোনো : ২০০ গ্রাম ; রসুন বাটা : ৪ চা-চামচ ; আদা বাটা : ৩চা-চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : ২ চা-চামচ ; লঙ্কাগুঁড়ো : ৩ চা-চামচ ; গরম মশলার গুঁড়ো : ১$^{১}/_{২}$ চা-চামচ ; ঘি : ৪ চা-চামচ ; নুন : আন্দাজমতো ; চিনি : স্বাদমতো ; তেজ পাতা : ২ টি ; তেল : ১০০ গ্রাম ; টক দই : ১০০ গ্রাম।

কী করে করবেন

মাংসটা ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। কড়াতে সবটা তেল দিন। তেল গরম হলে তাতে $^{৩}/_{৪}$ পেঁয়াজ কুঁচো এবং চারটে তেজপাতা দিন। পেঁয়াজ কুঁচো সোনালি রং হলে, আদাবাটা, রসুন বাটা, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, টক দই এবং নুন একে একে দিয়ে দিন। মশলা ভাজা-ভাজা হলে, মাংসটা দিন। নেড়ে চেড়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিন। ঢাকা দেবার আগে বাকি $^{১}/_{৪}$ পেঁয়াজ কুঁচো দিয়ে দিন। এতে গন্ধটা ভাল হয়। মাংসের জল শুকিয়ে গেলে এবং আধ সেদ্ধ হলে, মাংসে জল দিয়ে, ঢেকে দিন। এমন পরিমাণ জল দিতে হবে, যাতে মাংস সুসিদ্ধ হয় এবং ঝোলও গা-মাখামাখা হয়। নামাবার আগে মাংসে চিনি, ঘি ও গরম মশলা দিন। পাত্রে সাজিয়ে দিলেই মাংসের ঘ্রাণ ও চেহারা দেখে জিভে জল আসবে।

চাল-ফুলকপি

কী কী লাগবে

ফুলকপি : ১টা ; গোবিন্দভোগ চাল : ১মুঠো ; আদা বাটা : ২চা-চামচ ; জিরে গুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; ধনে গুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; লঙ্কাগুঁড়ো : ১ চা-চামচ ; টোম্যাটো : ২ টি (মাঝারি) ; গরম মশলার গুঁড়ো : $^{১}/_{২}$ চা-চামচ ; ঘি : ১ চা-চামচ ; তেল : ৫০ গ্রাম ; নুন : আন্দাজমতো ; চিনি : স্বাদমতো ; গোটা জিরে (সাদা) : ১ চা-চামচ ; তেজপাতা : ২/৩টে।

কী করে করবেন

ফুলকপিটা বড় বড় টুকরো করে কেটে একটু জলে ভাপিয়ে নিয়ে, জলটা ফেলে দিন। কড়াতে সবটা তেল দিয়ে তাতে জিরে ও তেজপাতা দিন। সম্বার দিয়ে, ফুলকপি ছেড়ে দিন। ফুলকপিটা আধা ভাজা হলে গোবিন্দ ভোগ চালটা ধুয়ে দিন। চাল ভাজা হলে আদাবাটা, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, টোম্যাটো ও নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মশলা ভাজা ভাজা হলে অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ কমিয়ে দিন। অল্প আঁচে কপি সেদ্ধ হয়ে যাবে, ঝোলও বেশি থাকবে না। চিনি, ঘি ও গরম মশলার গুঁড়ো দিন। চাল ফুলকপি রেডি। এবার পাতে দিলেই হয়।

আমসত্ত্ব ও জলপাই-এর চাটনি

কী কী লাগবে

জলপাই : ১০টি ; আমসত্ত্ব : ১০০ গ্রাম ; পাঁচ ফোড়ন : $^{১}/_{২}$ চা-চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : $^{১}/_{২}$ চা-চামচ ; নুন : ১ চিমটে ; চিনি : ২৫০ গ্রাম ; তেল : ১চা-চামচ।

কী করে করবেন

প্রথমে জলপাই সেদ্ধ করে, জলটা ফেলে দিন। নাহলে চাটনি খুব টক হবে, এবং চিনিও বেশি লাগবে। সেদ্ধ করা জলপাই চটকে দানাগুলো ফেলে দিন। ছোট ছোট টুকরো করে আমসত্ত্ব কেটে, জলপাইয়ের সঙ্গে চটকে নিন। কড়াতে তেল গরম করে, তাতে পাঁচফোড়ন সম্বার দিয়ে, আমসত্ত্ব ও জলপাই-এর ক্বাথটা ঢেলে দিন। সঙ্গে অল্প জলও দিন, যাতে আমসত্ত্বটা জলপাইয়ের সঙ্গে মিশে যায়। পাঁচ মিনিট ফোটাবার পর চিনি দিয়ে আরও একটু সময় ফোটান, যাতে সবটা চিনি গলে যায়। এক চিমটে নুন দিতে ভুলবেন না কিন্তু, নাহলে স্বাদে একটু কম পড়ে যাবে।

আলুর পায়েস

কী কী লাগবে

আলু : ২টি (মাঝারি মাপের) ; দুধ : ১ লিটার ; চিনি : স্বাদমতো ; কিশমিশ : ২৫ গ্রাম ; ছোট এলাচের গুঁড়ো : সামান্য।

কী করে করবেন

মিনিট দশেক দুধটা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। আলুর খোসা ছাড়িয়ে, আলু দুটো মিহি করে গ্রেট করে নিন। গ্রেট করা আলু ৭/৮ বার ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। আলুটা ভাল করে চিপে, জল ঝরিয়ে ফুটন্ত দুধের মধ্যে দিন। কিশমিশটাও দিন। মিনিট পাঁচেক ফোটানোর পর, চিনিটা দিয়ে দিন । দুধ ঘন হলে তাতে ছোট এলাচের গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। খেয়াল রাখতে হবে, দুধ যেন খুব ঘন না হয়ে যায়। আলুর পায়েস করতে খুব সোজা, কিন্তু খেতে খুবই ভাল। অনেকটা রাবড়ির মতো।

কালী মাহাত্ম

কালীপুজো হয় বাঙালির ঘরে ঘরে। কালী ঠাকুরের নানা বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করে লিখেছেন **রমাপদ পাহাড়ি।** রয়েছে **সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়**-এর আদ্যাশক্তি নিয়ে প্রতিবেদন

'কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।' রামপ্রসাদের কথা। এই কাল নির্মম এবং সত্য তো বটেই। তাই বলে চূড়ান্ত সত্য নয়। অনেকটা হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে। হয়তো। কিন্তু কালেরও নিয়ন্ত্রী শক্তি আছে। তার নিয়ন্ত্রক কে, তার খোঁজেই যোগী পুরুষরা যুগের পর যুগ, কালের পর কাল নিরন্তর সাধনা করে চলেছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন, কালশক্তির প্রভাবেই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি।

ঈশ্বরের সৃষ্টিশালা থেকে প্রতিদিন কোটি কোটি মানব-প্রাণী পৃথিবীর আলো-বাতাসে মুক্তি পাচ্ছে। হাঁটি হাঁটি পা পা। পৃথিবীটাকে নয় ছয় করবে। জল, খাদ্য, আলো, বাতাস, ভোগ করবে। তারপর নেতিয়ে পরবে। কোথাও কোথাও একটা-দুটো মানুষ জন্মে যাবে। অবস্থা-ব্যবস্থা দেখে ছটফট করবে। চিৎকার করতে থাকবে, 'বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচো, বাঁচো'। লিভ, অ্যান্ড লেট লিভ। এঁদের কেউ ক্রুশে ঝুলবেন, কেউ পুড়ে মরবেন, কারও মুণ্ডচ্ছেদন হবে। কেউ রাজৈশ্বর্য ছেড়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরে নগরে ঘুরবেন।

পৃথিবীটা এক বিশাল খাটিয়া। সেখানে 'উপোসী' ছারপোকাদের ছৌ-নাচ শুরু হয়েছে। 'চুষে লে, শুষে লে। যা পারিস গুছিয়ে লে।' আর খাটিয়াটি ইঞ্চি ইঞ্চি করে শ্মশানের দিকে সরছে। চিতা বহ্নিমান। সত্যজিৎ রায় একটি ছবিতে বলেছিলেন, কোনও কোনও জিনিস আছে সোজা আর কুছ কুছ চিজ হ্যায় ট্যারা। বিখ্যাত ডায়লগ। আঙুল দিয়ে দেখিয়েও ছিলেন অভিনেতা। পৃথিবীতে সোজা পথে যেমন চলা যায়, আবার চলতে চলতে একটু ঘুরপথেও মানুষ চলে যেতে পারে। কিন্তু নৈতিক শাসনটা শিথিল হয়ে গেলে তখন মনে হয়, সব অন্ধকার হয়ে গেল। আজকে এই মুহূর্তে আমরা যে অবস্থায় আছি, তাতে শেক্সপিয়ারের একটি কথা মনে পড়ছে। 'টাইম ইজ আউট অফ জয়েন্ট,' সময়ের সমস্ত খিল খুলে গেছে। এর পরিণতি কী হবে জানি না। সব পিছন দিকে ছুটছে। উল্টো ক্যালেন্ডার। সময়কে জব্দ করেছি। 'কাউন্ট ডাউন'। শতাব্দীর পশ্চাৎ যাত্রা। অনেকদিন আগে ত্রৈলোক্যনাথ 'ডমরুচরিত্রতে লিখেছিলেন, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে মশাদের সাইজ চড়াইপখির মতো। তাদেরও বাবু আছে। কে কোন মানুষের রক্ত শুষবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সেই দিন আসছে—যখন সব মানুষই কোনও না কোনও দলভুক্ত হবে। পার্টির থলে থেকে পিল পিল করে বেরোবে। মারামারি, কাটাকাটি করে থলেতে ঢুকে যাবে। সব প্রাণীতে পরিণত হবে। অবশেষে কঙ্কাল। স্কাল অ্যান্ড স্কেলিটন। এই হল গিয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থা। কাটাকুটিতে আমরা মেতে আছি। এই 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' কিন্তু মায়ের অগোচর নয়।

সৃষ্টি যখন আছে, ধ্বংসও আছে। মা কালী সেই দেবী, যিনি সংহার করেন, আবার বরাভয়ও প্রদান করেন। কলিযুগের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আর বোধহয় বেশিদিন নয়, মহাপ্রলয় আসন্ন। মহাপ্রলয়ে সেই মহাকালই পুনরায় সমগ্র সৃষ্টিকে গ্রাস করবে। মনে রাখতে হবে, এই যে মহাকাল, সেই পরিণামের অধীন। মহাপ্রলয়

আসন্ন। মহাপ্রলয়ে কালশক্তি মহাকালীর ভিতরেই নিঃশেষে লীন হয়ে যাবে।

কালের যখন উৎপত্তি হয় নি, তখনও ছিলেন মহাকালী। যে কাল সকল জীবের গ্রাসকারী, সেই কালেরও যিনি গ্রাসকারিনী, মহানির্বাণ তন্ত্র বলে তিনিই কালী। আদ্যাশক্তি। কালী হলেন নিখিল বিশ্বের আদি বীজ। মায়ের কালো রূপ বৈভবের মহিমা বাক্য-মনের অগোচর।

মহানির্বাণ তন্ত্র বলছে, 'সৃষ্টেরাদৌ
ত্বমেকাসীত্তোমারুপগোচরম'। অর্থাৎ হে দেবী, সৃষ্টির আদিতে তমো রূপে তুমিই ছিলে। তোমার সে রূপ বাক্য ও মনের অগোচর। মা কালী মহাশক্তি। যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে, সব কালীর মধ্যেই আছে। আদি, অনন্ত, বর্তমান সবই কালী মায়ের মধ্যে আছে। তাকে আমরা অর্বাচীনরা শুধু ধ্বংসের দেবী রূপেই দেখে থাকি। প্রশ্ন হল, তাহলে বাঙালির ঘরে ঘরে তিনি পূজিতা হন কী করে? আসলে ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে। যেমন ভাবে ঘন কালো রাতের পর আসে উজ্জ্বল দিন। ঘন কালো মেঘের আড়ালে যেন ঝলমলে সূর্য হাসে, ঠিক সেইভাবে ধ্বংসের পর হয় সৃষ্টি। না ভাঙলে গড়ে উঠবে কী করে!

মা কালী হলেন, জগতের মূল শক্তি। ইনি মহা সরস্বতী। আবার ইনিই মহালক্ষ্মী। ইনি রুদ্রাণী, শিবানী। ইনি ব্রহ্মার শক্তি ব্রাহ্মণী, নারায়ণের শক্তি নারায়ণী। শিবের শক্তি শিবা। ইনিই কৌমারী, গন্ধেশ্বরী। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি সীতা দেবী (রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী)। ইনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী মা সারদা। ইনি মহিষমর্দিনী চণ্ডী। ইনি চামুণ্ডা, কৌশিকী, দুর্গা, ভগবতী। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে। মায়ের ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটি পাতাও নড়ে না। আমাদের যে এই ব্রহ্মাণ্ড, তা তো মহামায়ার ইচ্ছেতেই রচিত।

সংহার শব্দের আমরা সাধারণভাবে অর্থ করে থাকি 'ধ্বংস'। কিন্তু সঠিক অর্থ হল 'সংহরণ'। এ হল নিজের ভিতরে প্রত্যাকর্ষণ। যেমন করে সমুদ্রের ঊর্মিমালা সমুদ্রের বক্ষ থেকে উথলে ওঠে, আবার সেই সমুদ্রে তার লয় হয়। যেমন করে ঊর্ণনাভ, অর্থাৎ মাকড়সা তার গর্ভ থেকে জাল রচনা করে আবার নিজের পেটেই গুটিয়ে নেয়।

মৃত্যুর অর্থ পৃথিবী থেকে, নিকটজনের থেকে চির বিদায় নেওয়া নয়। জগৎ জননীর কোলে আশ্রয় পাওয়া। কালী মহাদেবের শক্তি মূর্তি। সৃষ্টি ও ধ্বংসে সমভাবে বিকশিতা। বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বৃক্ষের উদ্ভব হয়। দেহের ধ্বংস তার অন্য দেহ প্রাপ্তি। এই সুন্দর করুণাময়ী মহাশক্তি প্রকাশই হয় মা কালীর মূর্তিতে। তাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পালন ও সৃজন হয় মায়ের শক্তিতে। প্রকৃতির মহান মহিমময় চিত্রই দেবীশক্তি কালী। 'করাল বদনানং ঘোরং'। মাকে ভয়ঙ্কর বদনা বলা হয়েছে। আবার কখনও হাস্যমুখী মায়ের কথাও বলা হয়েছে। 'সুখপ্রসন্ন বদনাং'। পৃথিবীর আর কোনও ধর্মে মাকে অসীম, অপার করুণাময়ী, কল্যাণময়ী বলা হয়েছে কিনা জানা নেই। 'কল্যাণময়ী মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী'। চণ্ডীতে মায়ের পুজো সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সর্বভূতে মাতৃরূপে বিরাজিতা/সর্বভূতি শক্তিরূপে বিরাজিতা।' মা কালী সর্বধর্মের প্রতি সমানভাবে প্রতিভাত। প্রেমময়ী মা। বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক। ভগবান বিষ্ণু নিজের মাতৃশক্তিকে আদেশ দিলেন 'গচ্ছ দেবী, ব্রজং ভদ্রে,' হে কল্যাণী তুমি বৃন্দাবনে যাও। দেবী যশোদার গর্ভে এলেন ঈশাণীরূপেও। এই ঈশাণী তন্ত্রের কালী। বহুনামে ভাগবতে কালীর প্রকাশ।

এই প্রসঙ্গে সেই পরিচিত কাহিনিটি স্মরণ করা যাক। প্রজাপতি দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। কিন্তু শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করেননি। পার্বতী যেতে চাইলেন আমন্ত্রণ ছাড়া। অথচ শিব রাজী হলেন না। প্রথমে উমা অনুনয় বিনয় করলেন, কিন্তু তাতেও শিবের অনুমতি পাওয়া গেল না। তারপর দেবী অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। শিব ভীত হয়ে পলায়ন করতে চাইলেন। পালাবেন কোথায়?

যেদিকে পালাতে যাচ্ছেন আদ্যাশক্তি মহামায়া ভীষণ রূপ ধারণ করে মহাদেবকে বিমোহিত করলেন। দেবাদিদেব ভীত হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কারা, আমার পথরুদ্ধ করেছ? আমার গতিপথ রুদ্ধ করেছ?'— 'ভীত হয়ো না শম্ভু, এই দশ দিক ব্যাপ্ত আমারই রূপ,' বললেন, দক্ষ দুহিতা।

'কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বিদ্যা, ধূমাবতী তথা বগলা, সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা, এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীত্তিতা।' তোমার সম্মুখে আমি কালোরূপে দণ্ডায়মানা। কালী শবারূঢ়া, মহামেঘ বর্ণা, কালী চতুর্ভুজা। মহাকালকে গ্রাস করেন বলে কালিকা, তিনি ত্রিনয়না।

তোমার ঊর্ধ্বে আমি মহাকাল স্বরূপিণী তারা। 'তারয়তীতি', যিনি ত্রাণ করেন তিনি শিবের উপর অবস্থিতা। তিনি সুখ এবং মোক্ষ দান করেন।

ঈশানকোণে আমি মহেশ্বরী, ষোড়শী। তিনি শ্রীবিদ্যা। শ্রী দান করেন। ইনি বাল ও সূর্যবর্ণা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র ও রুদ্র তাঁর পাদমূলে থাকে। তিনি ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা। বামে ভুবনেশ্বরী রূপে আমি বিরাজিতা। সিঁদুরের মতো রক্তবর্ণা। ইনি রক্তপদ্মে বিরাজিতা। ইনি দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, কখনও চতুর্ভুজা।

আর তোমার সঙ্গে কথা বলছি আমি ভৈরবীরূপে। উদীয়মান সূর্যের মতো তাঁর গাত্রবর্ণ, ইনি চতুর্ভুজা। ললাটে অর্ধচন্দ্র বিরাজিতা। তোমার দক্ষিণ দিকে আমি আছি ছিন্নমস্তারূপে, ইনি দ্বিভুজা। একহাতে নিজের মুণ্ড ও অপর হাতে অসি। ইনি অস্থিমালা ধারিণী। একটি সাপকে যজ্ঞোপবীত রূপে গলায় ধারণ করেছেন।

অগ্নিকোণে আমি বিধবা, ধূমাবতীরূপে বিরাজিতা। ইনি দ্বিভুজা, বিধবা, ধূম্রবর্ণা। ইনি ধূম্রাসুরকে বধ করেছেন। শত্রুনাশিনী বগলারূপে তোমার পশ্চাতে আমি দণ্ডায়মানা। ইনি পীতবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিহিতা, ইনি দ্বিভুজা। একহাতে অসুরের জিহ্বা টেনে ধরেছেন, অপর হাতে মুদগর। বায়ুকোণে আমি মাতঙ্গীরূপে বিরাজিতা। ইনি শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা, কপালে অর্ধচন্দ্রধারিণী। মাতঙ্গাসুরকে তিনি বধ করেছেন।

নৈঋত কোণে আমি কমলারূপে বিরাজমানা। ইনি স্বর্ণবর্ণা। তাঁকে শ্বেতহস্তী স্নান করাচ্ছেন। স্বর্ণকুম্ভ পূণ্যজল দ্বারা। ইনি পদ্মের উপর বিরাজমানা। ইনি কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও ষড়ভুজা, কখনও অষ্টভুজা রূপে প্রতিভাত হন। দুর্গাপূজার অঙ্গরূপে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে রাত্রিতে কালীপুজো করা হয়। এটা অনেকটা কুলাচার। সে মায়ের অভয়দায়িনী রূপ। তাছাড়া সন্ধিপুজোর সময় মা চামুণ্ডার পুজো করা হয়। তিনি নরমুণ্ডমালিনী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, অতি ভীষণা। তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেছেন। এছাড়া প্রতেক অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় মায়ের পুজোর বিধিও প্রচলিত।

মা কেন দিগম্বরী?

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসে, মা কালী কেন দিগম্বরী? এর অর্থ, কোনও কিছুর বন্ধন তাঁকে বাঁধতে পারে না। তিনি মুক্ত, বন্ধনহীন বিহঙ্গ। দেশ ও কালের ওপরে তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি সকল জীবের মা।

কেন মুক্তকেশী?

মা মুক্ত স্বভাবা। তাই তিনি মুক্তকেশী। তাঁর জ্ঞান খড়্গের দ্বারা অষ্টপাশ ছিন্ন হলেই নিষ্কাম সাধক দেবীর কৃপা লাভ করেন। তবেই মুক্তি ঘটে। রামপ্রসাদের গানে তাই রয়েছে, 'মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।' দেবী কালীর সেই কেশ মৃত্যুর প্রতীক। চণ্ডীতে আছে মহিষাসুরের হাতে পরাজিত দেবতারা যখন ত্রিদেবের কাছে গেলেন, তখন ত্রিদেব ও সমস্ত দেবতাদের তেজরাশি একত্রিত হয়ে ভগবতী মহামায়ার আবির্ভাব ঘটে। যমের তেজে দেবীর কেশরাশি গঠিত হয়। মুক্তকেশ চিরবৈরাগ্যের প্রতীক। জ্ঞান তরবারির আঘাতে **অক্টোপাস** ছেদনকারী মা চির বৈরাগ্যময়ী। তাই তাঁর বিস্তৃত চুল।

মুণ্ডমালা কেন?

মায়ের কণ্ঠে শোভা পায় মুণ্ডমালা। কণ্ঠমালা পঞ্চাশৎ, যা সংস্কৃত পঞ্চাশটি বর্ণমালার প্রতীক। ১৪টি স্বরবর্ণ এবং ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ। অক্ষর ব্রহ্ম। তার ক্ষয় নেই। শব্দ ব্রহ্ম, অক্ষরের দ্বারাই শব্দের উৎপত্তি। এর অবস্থান মাথায়। আমরা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে দেবদেবীর স্তুতি করি। এই মন্ত্রের অবস্থান মণ্ডকের তালুতে সহস্রার পদ্মের মধ্যে। তাই অক্ষরের প্রতীক মুণ্ড মায়ের গলায়। কামধেনু তন্ত্রে দেবী স্বয়ং বলেছেন, 'মম কণ্ঠে স্থিতং বীজং পঞ্চাশদ বর্ণমদ্ভুতম'। রামপ্রসাদও গেয়েছেন, 'যত শোনো কর্ণপুটে সকল মায়ের মন্ত্র বটে, কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়া বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।' মুণ্ডমালা হল জ্ঞান ও শক্তির প্রতীক। দেবী ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। তিনি চেতনা দান করেন। অন্ধকারে আবদ্ধ জীবকে আলোর পথ দেখান।

হস্তের মেখলা কেন?

দেবীর কটিদেশে কর্তিত হস্তের মেখলা দেখতে পাই আমরা। এই হাত কর্মশক্তির প্রতীক। তোমার সকল কর্মের ফলদাতা আমি। সকাম ভক্ত যারা, তারা অতৃপ্ত কামনা নিয়ে দেহত্যাগ করে বলে পুনরায় মায়ের গর্ভে স্থান পায় এবং হস্ত মেখলা প্রতীকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

ত্রিনয়নী কেন?

মা কালী ত্রিনয়ন বিশিষ্ট। তিনটি চোখ তিনটি আলোর প্রতীক। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি। অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার থেকে মুক্ত করাই হল চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির কাজ। তিনটি চোখে দেবী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর ত্রিনয়নের ইঙ্গিতেই ত্রিকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নির্ধারিত হয়। সত্য, শিব ও সুন্দরের দর্শন হয় এই চোখের মাধ্যমে।

প্রকাশ্য দিবালোকে, সন্ধ্যায় বা রাতে আমরা যে কাজ করি না কেন, তা মায়ের চোখের নজর পেরিয়ে নয়। আমরা যদি গোপনে কোনও পাপ করি প্রভাব খাটিয়ে, যদি এই পৃথিবীর বিচারসভার হাত থেকে নিষ্কৃতিও পাই, তবুও দেবীর বিচার থেকে নিষ্কৃতি নেই।

দেবীর চারটি হাত কেন?

মায়ের চারটি হাত। তাঁর ওপরের দুহাতে অভয় ও খড়্গ। নীচে বরামুদ্রা ও ছিন্ন নরমুণ্ড। অভয় ও বরামুদ্রা সৃষ্টির প্রতীক। খড়্গ ও ছিন্ন নরমুণ্ড ধ্বংসের প্রতীক। আপাতভাবে বৈপরীত্য মনে হলেও দুই বিপরীত কাজই সাধিত হয় মায়ের দ্বারা। তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি, তাঁর ইচ্ছাতেই ধ্বংস। দেবী তাঁর খড়্গ দ্বারা অবিদ্যারূপী অসুরকে ধ্বংস করেন।

মা য়ে র দে হ ত ত্ত্ব

শিবের ওপর কালী কেন?
মহাদেব এখানে শবরূপে বিরাজমান। মৃত্যুরূপ শিবের বুকে অধিষ্ঠান করছেন স্বয়ং জগৎমাতা। এর অর্থ মৃত্যুকে জয় করা। জীবনের থেকে বড় কিছু নয়, এই সত্যকে প্রতিভাত করা। শিব স্থির, কালী গতিময়ী। গতি ঠিক রাখতে গেলে স্থিরের উপর তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

কৃষ্ণবর্ণা কেন?

কালী কৃষ্ণবর্ণা। কালো রং সকল বর্ণের অনুপস্থিত। দেবী বর্ণাতীতা। তাই কালো। আদিতে যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না, তখন ও তিনি ছিলেন। তিনি অনন্ত। তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। কখনও তিনি নীলবর্ণা, যা সুদীর্ঘ নীল আকাশের সঙ্গে তুলনীয়। এই নীল বর্ণের অর্থ দেবী অনন্ত। শ্যাম রং স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তা জাগায়। তাছাড়া, অনন্ত তাঁর লীলা। এই লীলা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও অগোচর। তাই মাতৃসাধক কালীকে শ্যামবর্ণা রূপেও দর্শন করেন।

বিবসনা কেন?

দেবী কালী উলঙ্গিনী। ঈশ্বরীর চাইতে জগতে আর বড় কিছুই নেই। তাই তিনি কী পরিধান করবেন! আসলে মা যে বিশ্বব্যাপী শক্তির অবস্থান। শক্তিকে আবরিত করা যায় না। তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তাই উলঙ্গ।

মায়ের স্তন বাৎসল্যের স্নেহধারার আধার। স্তনদ্বয় ক্ষীর দ্বারা নির্মিত। তিনি তাঁর বক্ষ নিঃসৃত ক্ষীর দিয়ে জগৎ পালন করেন। অন্নপূর্ণা রূপে পৃথিবীকে শস্যে ভরিয়ে দেন। তিনি শাকম্ভরী, তিনিই শতাক্ষী। পরম করুণাময়ী। সন্তানের দুঃখে তিনি কাঁদেন, আবার সন্তানের উল্লাসেই তিনি আনন্দিত হন।

রক্তমাখা জিভ কেন?

মায়ের রক্তমাখা জিভ রজঃগুণের প্রতীক। তিনি তাঁর শ্বেত দন্তপাটি দ্বারা জিভ কেটেছেন। শ্বেত বর্ণ হল স্বত্বঃগুণের প্রতীক। এর অর্থ মা আমাদের স্বত্বঃগুণ দ্বারা রজঃগুণকে সংহত করার শিক্ষা দিচ্ছেন। অনেক সময় আমরা কোনও অন্যায় বা মিথ্যাচার করলে জিভে কামড় দিই, অর্থাৎ অন্যায় করার স্বীকৃতি রূপে দেখা হয়। আবার অনেকে বলেন মা কালী রক্তপান করছেন তারই জন্য তাঁর জিভ লাল। রক্তপান করলেও দাঁতও লাল হবে, কিন্তু তা তো দেখা যায় না। আর মা সন্তানের রক্তপান করবেন কেন?

কেউ কেউ বলেন, শিবের উপর দাঁড়িয়েছেন বলে জিভে কামড় দিয়েছেন। অন্যদিকে, পুরাণকথায় শিবের ভাষ্যে পাওয়া যায়, মা কালী যদি শক্তি দেন, তাহলে তিনি শিব। তা নাহলে তিনি শিব থেকে শক্তিহীন শব হয়ে যান। তাই তিনি মায়ের পদতলে। অর্থাৎ সবই শক্তির অধীন।

মা শ্মশানবাসিনী কেন?

কর্মফল শেষে জীবের শেষ আশ্রয় হল শ্মশান। যেখানে জীব মায়ের কোলে সুখে নিদ্রা যায়। মায়ের আঁচলের তুলনা কোটি কোটি স্বর্গের সঙ্গেও হয় না। সেখানে বাৎসল্যের ছোঁয়া লেগেই থাকে, 'মায়ের কোলে ঘুমায় ছেলে, এ শান্তি মা কোথায় বল? তাই কালী মা মহাশ্মশানে বিচরণ করেন।

'মা কালীর দাস আমি'
স্বামী বিবেকানন্দ

সব কিছুতেই মাকালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। তবু আমি কতদিনই না তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আসল কথা এই, আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসিতাম, তাহাই আমাকে ধরিয়া রাখিত। আমি তাঁহার আশ্চর্য ভালবাসা অনুভব করিয়াছি। তখনও পর্যন্ত তাঁহার মহত্ত্ব আমার নিকট প্রতিভাত হয় নাই। পরে যখন আমি তাঁহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তখন ওই ভাব আসিয়াছিল। তাহার পূর্বে আমি তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক একটি শিশু বলিয়া ভাবিতাম, মনে করিতাম—এই জন্যই তিনি সর্বদা অলৌকিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখেন। এগুলি আমি ঘৃণা করিতাম। তারপর আমাকেও মা কালী মানিতে হইল। না, যে কারণে আমাকে মানিতে হইল, তাহা একটি গোপন রহস্য, এবং উহা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হইবে। সে সময় আমার খুবই ভাগ্য বিপর্যয় চলিতেছিল। ..... ইহা আমার জীবনে এক সুযোগ হিসাবে আসিয়াছিল। মা (কালী) আমাকে তাঁহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন। এই কথাই বলিয়াছিলাম, 'আমি তোমার দাস।' রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার! এই ঘটনার পর তিনি মাত্র দুই বছর জীবিত ছিলেন এবং ওই কালের অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ ছিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য নষ্ট হইয়া যায়। তোমরা জানো, গুরু নানকও এই রকম এমন একজন শিষ্যের খোঁজ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি তাঁহার শক্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে পারেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের কাহাকেও উপযুক্ত মনে করিলেন না। তাঁহার সন্তানসন্ততিরা তাঁহার কাছে অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া মনে হইল। তারপর তিনি এক বালকের সন্ধান পাইলেন, তাহাকে ওই শক্তি দিলেন, এবং দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তোমরা বলিতেছ, ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কালীর অবতার বলা হইবে কী? হ্যাঁ, আমিও মনে করি, কালী তাঁহার কার্য সম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহযন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন।

কালী, রূপে-রূপান্তরে

'ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে।'

'কালী' শব্দটি 'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ, যার অর্থ 'কৃষ্ণ বা ঘোর বর্ণ'। এটি পাণিনি বর্ণিত। মহাভারত অনুসারে, মা কালী দুর্গার একটি রূপ। আবার হরিবংশ গ্রন্থে কালী একটি দানবীর নাম। 'কাল' কথাটির অর্থ নির্ধারিত সময়, তা প্রসঙ্গক্রমে 'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর সমোচ্চারিত শব্দ 'কালো'র সঙ্গে এর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু লৌকিক ব্যুৎপত্তির দৌলতে এরা পরস্পর যুক্ত হয়ে গেছে। মহাভারতে এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি হত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মাকে বহন করেন। তাঁর নাম কালরাত্রি বা কালী। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক টমাস কবার্নের মতে, এই শব্দটি নাম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার কৃষ্ণবর্ণা বোঝাতেও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। যাই হোক না কেন, তন্ত্র ও পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপ পাওয়া যায়। দশমহাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কালী। তিনি স্বয়ং মূলা-প্রকৃতি হয়ে ভক্তমনের চাহিদা অনুযায়ী পরিচিত হয়েছেন নানা রূপে। তেমন তোড়ল তন্ত্রমতে কালী মোট আট প্রকার বা অষ্টধা। দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী গুহ্যকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও শ্রীকালী।

মহাকাল সংহিতায় এই সংখ্যাটিই আবার এক বেশি, অর্থাৎ নয় বা নববিধা। যেখানে মূল তালিকার হেরফের ঘটিয়ে ঢুকেছে বেশ কিছু নতুন নাম। যেমন— কালকালী, কামকলাকালী, ধনদাকালী ও চণ্ডিকাকালী। প্রতি বছর কার্তিকী অমাবস্যায় শ্যামাকালী পূজার পাশাপাশি মহামায়ার বিশেষ বিশেষ রূপের পুজো করলে ফলও মেলে নানা প্রকার।

এই প্রতিবেদনে আমরা দেখব, মায়ের সেই বিভিন্ন রূপগুলো কী কী এবং সেইসব রূপের আরাধনায় কী কী ফল পাওয়া যায়।

দক্ষিণাকালী

দক্ষিণ শব্দের অর্থ পুরুষ। বামা মানে শক্তি। শক্তি যখন পুরুষকে দ্রবীভূত করে তখন শক্তির অনুবর্তী হয় পুরুষ। দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ তিনি দক্ষিণাকালী। প্রচলিত ভাষায় আমরা যাঁকে শ্যামাকালী বলি। তবে শান্ত শ্যামাকালীর রূপটি এসেছে অনেক পরে, ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে। মূল দক্ষিণা কালীকার যেটি ধ্যানমন্ত্র সেটি পাঠ করলে কিন্তু শান্ত নয়, কালীর ওই চণ্ডরূপটিই ধরা পড়ে। 'করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম।'

যিনি উক্তরূপে ভূষিতা ছাড়াও শবারূঢ়া, মহাভীমা, ঘোরদ্রংষ্ট্রা, ত্রিনয়নী, হাস্যযুক্তা ও মুহুর্মুহু রক্তপানকারিণী। তাত্ত্বিকরা এই নামের ব্যাখ্যা করেন এইভাবে— দক্ষিণদিকের অধিপতি যম। তিনি কালীর ভয়ে পলায়ন করেন বলে তাঁর নাম দক্ষিণাকালী।

এই মায়ের পুজো করলে ত্রিবর্ণা তো বটেই, সর্বশ্রেষ্ঠ ফল অর্থাৎ মুক্তিফলও দক্ষিণাস্বরূপ পাওয়া যায়

সিদ্ধকালী

এই কালীর সঙ্গে আমাদের খুব একটা পরিচিতি নেই। কালীতন্ত্রে এঁকে দ্বিভূজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র আবার ইনি ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী। এই মূর্তির ডানহাতের খড়্গাঘাতে চন্দ্রমণ্ডল থেকে নির্গত হওয়া অমৃতরসে নিজেই প্লাবিত এবং বাঁ হাতের একটি কপালপাত্রে ওই অমৃত ধারণ করে পরমানন্দে পানে রত। সালংকারা। শায়িত মহাদেবের বুকে বাঁ পা রেখে। সিদ্ধকালী ডান পা তাঁর দুই উরুর মধ্যে স্থাপন করেছেন। গৃহস্থ নয়, সিদ্ধ সাধকের কাছেই তিনি আরাধ্যা।

গুহ্যকালী

এই কালীর সাধনায় ভয়ানক গোপনীয়তা আছে। গৃহস্থের কাছে তা অপ্রকাশেয়। ভয়ানক তাঁর চেহারাটিও। যেটি দেখেই গা ছমছম করে ওঠে। গাঢ় মেঘের মতো তাঁর গায়ের রঙ। লোলজিহ্বা, কটিতে একটি ক্ষীণ বস্ত্র ও কাঁধে সাপের যজ্ঞোপবীত। উপরন্তু তিনি নিয়মিত মড়ার মাংস ভক্ষণে অভ্যস্তা।

স্বাভাবিকভাবেই এমন দেবী কোনও সংসারীর আরাধ্যা হতে পারেন না। স্বামী অচ্যুতানন্দ লিখেছেন, এই পর্যন্ত তিনি একটি মাত্র গুহ্যকালীর মূর্তি দেখেছেন। সেটি মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তবর্তী অকালীপুর গ্রামে অবস্থিত। মূর্তিটি মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত। তবে বাইরে একটি ভয়ার্তভাব থাকলেও তাঁর সঠিক বরাভয় মূর্তিটি কিন্তু প্রাণে যথারীতি সাহস জোগায়। মহাকালসংহিতা মতে নববিধা কালীর মধ্যে এই গুহ্যকালীই সর্বপ্রধান, মন্ত্রও বহু। প্রায় আঠেরো প্রকারের।

মহাকালী

তন্ত্রসার মতে, মহাকালী পঞ্চবক্ত্রা এবং পঞ্চদশনয়না। শ্রীশ্রীসপ্তসতী চণ্ডীতে উল্লেখ আছে, আদ্যাশক্তি দশবক্ত্রা, দশভূজা, দশাপাদা, ত্রিংশল্লোচনা। ইনিও ভৈরবী তবে গুহ্যকালীর সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। ইনি সাধনপর্বে ভক্তকে উৎকট ভীতি প্রদর্শন করলেও অন্তিমে তাঁকে রূপ, সৌভাগ্য, কান্তি ও শ্রী প্রদান করেন। দেবীর দশভূজে রয়েছে যথাক্রমে খড়্গ, বাণ, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভুসুণ্ডি, পরিখ, ধনু, রুধিরা ও নরমুণ্ড।

ভদ্রকালী

কথাটির অর্থ কল্যাণ এবং কাল শব্দের অর্থ শেষ সময়। তবে কালীর স্বভাববিরুদ্ধ অহেতুক ভদ্রতার সঙ্গে কিন্তু এর কোনও যোগ নেই। মরণকালে যিনি জীবের মঙ্গল বিধান করেন তিনিই ভদ্রকালী। অবশ্য ভদ্রকালী নামটি আমরা শাস্ত্রে আরও বিভিন্ন জায়গায় পাই। যেমন দক্ষযজ্ঞ বিনাশের কালে, মহিষাসুর নিধনকালে, এমনকী বাগদেবী সরস্বতী পুজোর মন্ত্রচারণে। কাজেই ভদ্রকালী একাধারে দেবী দুর্গা, সরস্বতী ও কালী। কালিকাপুরাণে দেবীর অসামান্যা রূপ বর্ণিত হয়েছে। অতসী ফুলের মতো তাঁর গায়ের রঙ, মাথায় জটাজুট, ললাটে অর্ধচন্দ্র ও গলায় কণ্ঠহার। কিন্তু তন্ত্রসারের ভদ্রকালী যথারীতি কালীর মতোই উপরন্তু তিনি যেন সর্বদা ক্ষুধার্ত। স্বভাবতই এই পরস্পর বৈপরীত্য সাধক তথা ভক্তকুলের কাছে ভদ্রকালীর এক অন্যমাত্রা দিয়েছে।

গ্রাম বাংলায় অনেক জায়গাতেই আজও বহু প্রসিদ্ধ ভদ্রকালী মূর্তি পাওয়া যায়, যেখানে বিগ্রহ নিত্যপূজিতা হন নিষ্ঠা সহকারে।

চামুণ্ডাকালী

কালীর একটি প্রসিদ্ধ রূপ। সাধক ও ভক্তকুলের কাছে ইনি চির আকাঙ্খিত। অগ্নিপুরাণে মোট আট প্রকার চামুণ্ডার কথা বলা হয়েছে। চামুণ্ডাকালীর উৎপত্তির ইতিহাসটি বিচিত্র এবং সর্বজন পরিচিত। দেবী ভাগবত ও মার্কেণ্ডয় পুরাণের বর্ণনানুযায়ী চণ্ড-মুণ্ড বধের নিমিত্ত দেবী ভগবতীর ভ্রুকুটি কুটিল ললাট থেকে তাঁর উৎপত্তি। নীল পদ্মের মতো তাঁর গায়ের রং, হাতে অস্ত্র, দণ্ড আর চন্দ্রহাস। পরিধানে বাঘছাল অস্থিচর্মসার শরীর, বিরাজ দাঁত। সাধারণত দুর্গাপুজায় সন্ধিপুজার সময় অষ্টমী-নবমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়।

পূজক অশুভ শত্রু বিনাশের জন্য তাঁর কাছে শক্তি প্রার্থনা করে পূজা করেন। স্বভাবতই চামুণ্ডা সমস্ত কালীর মধ্যে প্রচণ্ডা ও ভয়ভীষণা।

শ্মশানকালী

শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রামে-গঞ্জে কোনও কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় এমন কালীমূর্তির দেখা পাওয়া যায় প্রায়শই। মানুষকে যমের বাড়ি পাঠানোর গুরুদায়িত্বটি যাঁর মধ্যে প্রকট তাঁরই পোশাকি নাম শ্মশানকালী। তন্ত্রসারের মতে, শবসাধনার সাধকরা মাকে একান্তভাবে পেতে এই বিশেষ রূপের সাধনা করেন। তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত ব্যতীত এই দেবীর পুজা সাধারণের না করাই ভাল। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যাঁর পায়ে একটি বেলপাতা ও জবাফুল দিতে পারলেই নিজেদের ধন্য মনে করেন, তাঁর পদ সকল মানুষেরই পরম কাম্য হওয়া উচিত। শ্মশানকালী কাজলের পাহাড়ের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, রক্তবর্ণা নেত্রা ও অতি শুষ্কদেহা। তাঁর এক হাতে পূর্ণপাত্র মদ্য। তা নিয়ে উলঙ্গিনী হয়ে তিনি কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাচ্ছেন। স্বভাবতই গৃহস্থের গৃহে এই কালীর ছবি রাখাও অমঙ্গলের। এই নির্দেশ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের। যদিও এই শ্মশানকালীই জীবনমৃত্যুর প্রকৃত ছবিটি আমাদের সঠিকভাবে চিনিয়ে দেন। শোনা যায়, আগেকার দিনে ডাকাতরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে নরবলি দিয়ে এই দেবীর পুজো করত।

এই শ্মশানকালীই উগ্রতারা, ইনিই মা ছিন্নমস্তা, ইনিই ধূমাবতী, আবার ইনিই মা কমলা। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত শ্মশানেই শ্মশানকালীর পুজো হয়।

শ্রীকালী

গুণ ও কর্ম অনুসারে কালীর আরেকটি রূপভেদ শ্রীকালী। কারও কারও মতে, ইনি দারুক নামক অসুরের নাশ করে দারুকাশুর নামে পরিচিতি পেয়েছেন। এই দেবী নাকি মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠের গরলে নিজের দেহকে কৃষ্ণবর্ণা করেছেন। শিবের মতো ইনিও ত্রিশূলধারিণী ও সর্পযুক্তা।

রহস্যময় কালীবৈচিত্রের এখানেই শেষ নয়। গোটা তন্ত্রশাস্ত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন তালিকা বহির্ভূত আরও অজস্র কালী। যেমন আদ্যাকালী, সৃষ্টি আদিশক্তি। ইনি সাধকের প্রসন্ন মনের ধ্যানগম্যা। অষ্টভুজা কালী সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্রী। ইনিও মহাকালী। রক্ষাকালীর পুজা হয় সাধারণত খরা, বন্যা, মহামারী থেকে মানুষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। কামকলাকালী ভক্তকে কামনা অনুযায়ী ফল দেন, ধনদা কালী দেন ধন। রটন্তী কালী, ফলহারিণী কালীর পুজো করা হয় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে। এছাড়াও জয়দ্রথসামল ও শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে শোনা যায় বেশ কিছু বিরল কালীর কথা। যেমন ওম্বরকালী, ইন্দীবরকালী, রমণীকালী, ঈশানকালী, জীবকালী, বীর্যকালী, প্রক্ষাকালী, সপ্তার্ণকালী, হংসকালী, বশীকরণকালী ইত্যাদি। অভিনব গুপ্তর তন্ত্রালোক ও তন্ত্রসারে পাওয়া যায় সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী, রক্তকালী, স্বকালী, যমকালী, মৃত্যুকালী, রুদ্রকালী, পরমার্থকালী, মার্তণ্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী, মহাভৈরবঘোর কালী ও চণ্ডকালী— এই তেরোটি কালীর নাম। এইসব বিরল কালীর ধ্যান ও মন্ত্র যে সবসময় প্রচলিত তন্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায় এমন নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই সাধকের অভীষ্ট অনুসারেই নির্ধারিত হয়েছে এঁদের রূপ।

কখনও ধ্যানলব্ধ হয়ে প্রকাশ্যে এসে পড়েছেন। যেভাবেই আসুন না কেন, এই সব কালী যুগে যুগে প্রভাবিত করেছেন শক্তিসাধনার পীঠস্থান বাংলাকে, একইসঙ্গে বাংলার প্রসিদ্ধ শক্তিসাধকদেরও।

তথ্য সহায়তা : বিপুলচন্দ্র রায়, অর্ণব দত্ত

মা সন্তানের প্রথম বন্ধু। প্রথম শিক্ষকও। সন্তান যাতে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে তার প্রথম পাঠ শুরু হয় মায়ের কাছ থেকেই। এই শিক্ষা দিতে হলে শিশুর মন, আচরণ, চলাফেরা কথাবার্তা সবদিকে নজর রাখতে হবে মা-কেই। কীভাবে দশভূজা হয়ে সন্তানকে দশদিক থেকে রক্ষা করে সুশিক্ষা দেবেন, তারই পরামর্শ দিলেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ সত্যব্রত কর**

শিশুর সু-শিক্ষা

সমস্যা ১ : দাদা-দিদিরা কারণে-অকারণে কান মলে দেয়, জোর করে আমার টিফিন খেয়ে নেয়।

সমাধান : আগে এ ধরনের ঘটনা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কলেজে গেলে হত। এখন স্কুল স্তরেও শুরু হয়েছে র‍্যাগিং। নানাভাবে উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা নিচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অত্যাচার করে। ছেলেমেয়েরা এ ধরনের অভিযোগ মায়ের কাছে জানালে প্রথমে তাদের প্রধানশিক্ষককে ব্যাপারটা জানাতে হবে। 'সময় পাচ্ছি না', 'পরের সপ্তাহে যেতে পারি কিনা দেখছি', এ ধরনের গড়িমসি চলবে না। ঘটনা জানার পর যত দ্রুত সম্ভব প্রধান শিক্ষককে জানানো দরকার। তিনি যদি ব্যবস্থা না নেন তাহলে স্কুলের সেক্রেটারি। প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দিলে ভবিষ্যতে নিজের সন্তানের বড় কোনও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সমস্যা ২ : পুলকারের কাকু জড়িয়ে ধরে আদর করে। খুব অস্বস্তি হয়।

সমাধান : ছোট ছোট বাচ্চাদের অনেক সময়ই এ ধরনের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হয়। অনেক সময় এ ধরনের কাজ যারা করে তারা ভয় দেখায় বাড়িতে বললে মারধর করবে বলে। মা-যদি শিশুকে আগেভাগেই বলে রাখেন যে কেউ বেশি আদর করলে যেন মাকে জানাতে দ্বিধা না করে। তাহলে শিশু স্বচ্ছন্দে তা মাকে জানাতে পারবে। যদিও অনেক সময়ই শিশুরা মাকে জানালে, মা উল্টে শিশুকে বকাবকি করেন। ফলে তারা বলতে ভয় পায়। সমস্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কাজেই মা কীভাবে শিশুকে সামলাবেন তা নিজেকেই ঠিক করতে হবে। শিশুকে ঠিকভাবে রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে তাঁকেই।

সমস্যা ৩ : স্কুলে গিয়ে প্রায়ই অন্য বন্ধুদের মারধর করে।

সমাধান : অনেক পরিবারেই ছোট থেকে শিশুর মধ্যে প্রতিযোগীতামূলক ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়। ফলে বন্ধুত্বসুলভ ব্যাপারটা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। বিশেষ করে কোনও বন্ধু ভাল রেজাল্ট করলে যখন তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়, তখন নিজের ভাল রেজাল্ট করতে না পারার রাগ গিয়ে পড়ে অন্য ছাত্রদের ওপর। তখন সেই শিশু তাদের অকারণে মারে, গালিগালাজ করে। কাজেই মায়ের উচিত ছেলেমেয়েদের কখনওই অন্যের সঙ্গে তুলনা না করা। শিশুকে আদর দিয়ে, ধৈর্য ধরে বোঝানো দরকার যে ভাল রেজাল্ট হলেই জীবনে সে কিছু করতে পারবে। সবাই তাকে ভাল বলবে। কখনও পরীক্ষায় খারাপ ফল করলে বকাবকি না করে কী করলে ভাল হবে তা খতিয়ে দেখবেন। কেন ভাল ফল করেনি তার কারণ অনুসন্ধান করে মায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাহলেই শিশুকে এ ধরনের আচরণ থেকে দূরে রাখা সম্ভব।

সমস্যা ৪ : ছোট-বড় জ্ঞান নেই। হুট করে যা খুশি বলে দেয়।

সমাধান : অনেক সময়ই এ জন্য দায়ী থাকেন অভিভাবকরাই। ছোটবেলা শিশু কিছু না বুঝেই হয়তো কাউকে কিছু বলল, যেটা আদৌ তার বলার কথা নয়। সেই কথা শুনে বাবা-মার হাসাহাসি হল। তা নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করা মানে আবার তাকে সেই

কথা বলতে উৎসাহিত করা। এসব যে নিছক বাবা-মার মজা — শিশু তা বুঝতে পারে না। সে ভাবে, এ ধরনের কথা বললে তাঁরা খুশি হবেন। আর একবার বলা শুরু করলে তা বাড়তেই থাকে। কিন্তু তিন বছর বয়সে যেটা শুধুই মজার, ৯ বছরে যে তা থাকে না শিশুর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কাজেই শিশু যখন প্রথমবার এ ধরনের ভুল করে তখনই তাকে তার মতো করে বোঝানো দরকার, যাতে ভবিষ্যতে এমন কথা সে না বলে।

সমস্যা ৫ : ক্লাসে প্রথম হওয়া ছাত্রের বই-খাতা-পেনসিল চুরি করে আনে।

সমাধান : বেশিরভাগ সময়ে শিশু এটা করে ফার্স্টবয়ের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। ভাবে, যে পেনসিল বা বই-খাতা না পেলে ওই ছাত্রটি আর ভাল ফল করতে পারবে না। বাবা-মা তার সঙ্গে তুলনাও দিতে পারবে না। খেয়াল করলে বোঝা যায় শিশুর এ ধরনের আচরণের জন্যও দায়ী বাবা-মা। বাবা-মায়েরাই শিশুর মনে ভেদাভেদ পরোক্ষভাবে তৈরি করে দিচ্ছেন। 'ও এত ভাল ছেলে, লজ্জা করে না ওর সঙ্গে খেলতে যাস'— এ ধরনের কথাবার্তাই শিশুকে বন্ধুর ক্ষতি করার ব্যাপারে প্রাণিত করে।

সমস্যা ৬ : দিব্যি স্কুলে যাচ্ছিল, পড়াশোনাও করত। কিন্তু হঠাৎ করে চুপচাপ হয়ে গেছে। পড়াশোনায় মন নেই। ভয় ভয় ভাব।

সমাধান : এ ধরনের লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হতে হবে। বেশিরভাগ সময়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হলে শিশুর মধ্যে এ ধরনের উপসর্গ প্রকাশ পায়। শিশু খুব উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। কারণে অকারণে কাঁদে, রাতে ঘুমোতে চায় না ইত্যাদি। এরকম হলে শিশুকে আদর করে, ভালবেসে মনের কথা বের করতে হবে। তাকে সাহস জোগাতে হবে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হবে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে। ছোট থেকেই একটু করে শিশুকে বোঝাতে হবে কোনটা 'গুড টাচ' কোনটা 'ব্যাড টাচ'। স্পর্শের রকমফের সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে। বাইরে যা ঘটবে সব কথা যেন সে মাকে খুলে বলে সেই সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে শিশুর সঙ্গে। নিয়মিত শিশু বা কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে মা এবং বাবার খোলাখুলি নানা বিষয়ে কথা বলা দরকার। শুধু খাওয়া বা পড়া নিয়েই ছেলেমেয়ের পিছনে লেগে থাকবেন না। তাঁরা কী ভালবাসে কোন বস্তু যেমন স্কুলে কী হল, সিনেমা, গল্পের বই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবেন।

- মা কে অবশ্যই সত্যি কথা বলা অভ্যেস করতে হবে। নিজে মিথ্যে বলবেন আর শিশুকে সত্যি কথা বলতে বলবেন তা যেন না হয়। সে খেয়াল রাখতে হবে।
- ছেলে-মেয়েকে টি ভি দেখার সময় বেঁধে দিলে, নিজেকেও সময় মেনেই টিভি দেখতে হবে।
- ছোটদের সামনে স্কুল টিচার বা প্রাইভেট টিচারের সমালোচনা করা উচিত নয়।
- অন্য বন্ধুদের সঙ্গে লেখাপড়া, খেলাধুলো কিংবা গায়ের রঙ নিয়ে তুলনা দেওয়া চলবে না।
- ছেলেমেয়ের সামনে বাবা-মায়ের অশান্তি কোনওভাবেই প্রকাশ করা চলবে না। একে অন্যকে অসম্মানজনক কথা না যেন বলেন সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।
- শিশু কোনও কথা বললে মন দিয়ে শোনা উচিত। যদি মনে হয়, মিথ্যে বলছে তা-ও। শুনে নিয়ে তাকে বোঝাতে হবে, এ ধরনের মিথ্যে বলা উচিত নয়।
- শিশু বা কিশোর-কিশোরী হঠাৎ মনমরা হয়ে পড়লে, সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করুন, কী হয়েছে।

মা-এর পরী যখন তিথি

● ‘টাইটস আর ইয়েলো টপ পুজোয় কিনেছি। কিন্তু সঙ্গের জুতোটা আমার খুব প্রিয়। দোকানে দেখেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।’

● কালো এই ড্রেস তিথি কিনেছে অন লাইন স্টোর থেকে। ‘দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল, তাই অর্ডার দিলাম। লাল না কালো ভাবতে ভাবতে কালোই বললাম, এখন দেখছি ওটাই রাইট চয়েস।’

ছবি : আশিস সাহা
রূপসজ্জা : অভিজিৎ কয়াল
কেশ সজ্জা : গণেশ

'মা' ধারাবাহিকের চার বছর বয়স হল। ছোট্ট পরী এখন বড় হয়ে গেছে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, হাসি কান্না, বিপদ-আপদ পেরিয়ে পরী বড় হয়েছে। কিন্তু ওর জীবন এখনও সহজ সরল নয়। এই পরী আসল জীবনে তিথি। এখনও স্কুলে পড়ছে। আর পাঁচটি টিনেজার এর মতো তিথিও ফুল অফ এনার্জি! নানা ধরনের পোশাক-আশাক পরতেও ভালবাসে। তারই কিছু ভাগ করে নিল সুবিধার পাঠকদের সঙ্গে।

● এই কালো মিনি স্কার্ট তিথিকে একজন বন্ধু উপহার দেয়। সঙ্গে ঢোলা ফুশিয়া কালো ব্লাউজটি তিথিই কিনেছে। 'ওই রানি গোলাপি রঙ আমার খুব প্রিয়।'

● জিনস, বিশেষত লাল জিনস তিথির খুব প্রিয়। 'জিনস পরে সবচেয়ে ফ্রি থাকি।'

মিমি চক্রবর্তী বর্তমানে টালিগঞ্জের সম্ভাবনাময় নায়িকা। ‘গানের ওপারে’ সিরিয়ালে তিনি সবার চোখ কাড়েন। এরপর ‘বাপী বাড়ি যা’, ‘বোঝে না সে বোঝে না,’ ও তারপর ‘প্রলয়’-তে মিমির অভিনয় ও উপস্থিতি যথেষ্ট সমাদৃত। সম্প্রতি বীরসা দাশগুপ্ত ও রবি কিনাগির দুটি ছবি শেষ করেছেন মিমি। দুটোতেই নায়ক সোহম। সে যাই হোক এত কাজের মধ্যেও মিমি সময় বার করেন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার। গত বছরের শীতে গিয়েছিলেন সুন্দরবনে, সেই অভিজ্ঞতাই ভাগ করে নিচ্ছেন সুবিধার পাঠকদের সঙ্গে।

সুন্দরী সুন্দরবন

তিনদিনের ছুটি চাই, বন্ধুরা মিলে ডিসাইড করি তিনদিন একসঙ্গে কাটাব কোনও না কোনও রোমাঞ্চকর জায়গায়। অনেক বাক বিতণ্ডার পর এক বন্ধুর পরিচিত কেউ সুন্দরবনে ট্রিপ অর্গানাইজ করে শুনে, আমরা ঠিক করি সুন্দরবনেই যাব। ব্যাস একবার যখন কোথাও যাব ঠিক হয়ে গেল আর দেরি নয়। দুদিনের মধ্যে সব সেট করে নেওয়া হল। এখান থেকে গাড়িতে ৩/৪ ঘণ্টার ড্রাইভ। তারপর লঞ্চে করে সুন্দরবন, সেখানে থাকব একটি রিসর্ট-এ। ট্রিপ অর্গানাইজার বলেছিলেন দুপুর দুপুরই লঞ্চঘাটে পৌঁছে যেতে, যাতে আমরা সময় মতো পৌঁছতে পারি সুন্দরবন। কিন্তু সব বন্ধুরা প্যাক করতে, কাজকর্ম গুটিয়ে বেরতে বেরতে আমাদের প্রায় বিকেল ৫টা হয়ে গেল। লঞ্চ ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। লঞ্চঘাটে শুধু আমাদের লঞ্চে অল্প আলো, আর চারদিক একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেদিন পূর্ণিমাও ছিল না যে চাঁদের আলো একটা রোম্যান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। লঞ্চের ক্রু আমাদের তাড়াতাড়ি লঞ্চে উঠতে বলল। ‘কোনও কথা বলবেন না, চুপচাপ বসে থাকবেন, আর আলো বন্ধ করে দিচ্ছি, তাতে ভয় পাবেন না। আসলে রাতে পশুপাখিকে আলো জ্বালিয়ে ডিস্টার্ব করতে চাই না। আর এই জলপথও রাতে তেমন সেফ নয়, জলদস্যুরা থাকে, তাই যতটা পারি সাবধানতা অবলম্বন করে এগোতে হয়।’

একদিকে বলছে, ভয় পাবেন না, অন্যদিকে জলদস্যুর ভয় দেখাচ্ছে... কথাগুলো শুনে আমরা ভয়ে চুপ করে গেলাম। এমনকী ফিস ফিস করেও কথা বলছি না। পাশাপাশি বসে, অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, হাত দিয়ে স্পর্শ করে মাঝে মধ্যে নিজেদের আশ্বস্ত করছি। যে আমরা আছি। এক সঙ্গে আছি। মাঝে মধ্যে মোবাইল জ্বালিয়ে হাত দিয়ে আলো আড়াল করে দেখে নিচ্ছি নিজেকে। শুধু লঞ্চের হালকা আওয়াজ, নদীর ছলাৎ ছলাৎ, মাঝে মধ্যে জোনাকি, আর অন্ধকার। হঠাৎ লঞ্চটা কেমন কেঁপে উঠল। ক্রু-র গলা শোনা গেল ‘বাঁ দিকে বাঁ দিকে’... তারপরই আমরা একদিকে হেলে গেলাম। অজান্তেই গলা থেকে আওয়াজ বেরিয়ে গেল সবার। চুপ করে থাকার নির্দেশ ভেঙে গেল। অল্প টাল খেয়ে লঞ্চও আবার তার গতিপথ ঠিক করে নিল। আর তখনই পাশ দিয়ে কালো ছায়ার মতো দেখলাম একটা নৌকো যাচ্ছে। দেখে মনে হল যেন একটা ভূতের নৌকো। নিকষ কালো একটা ছায়া। কিন্তু লঞ্চের আধিকারিক আশ্বস্ত করলেন আমাদের। ‘ওটা মাছধরা নৌকো। অন্ধকারে আমরা একে অপরকে দেখতে পাইনি দূর থেকে, তাই লাস্ট মোমেন্ট-এ ধাক্কা যাতে না লাগে তাই লঞ্চটা বাঁদিকে কাটালাম।’ ব্যাস হয়ে গেল। ব্যাপারটা যতটা সহজ শুনতে, অভিজ্ঞতাটি কিন্তু অতটা সরল নয়। নৌকোটি জলদস্যুদের হতে পারত, আমাদের ধাক্কা লাগতে পারত, লঞ্চটি দিকভ্রষ্ট হতে পারত... এসব সম্ভাবনার কথা ভেবে আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। এরকম সময় ভগবান অবধারিত ভাবে আমাদের মনে চলে আসেন, তাই না?

নম নম করতে করতে, শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু সবাইকে ডাকতে ডাকতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় আমরা পৌঁছে গেলাম সুন্দরবন।

যে রিসর্ট-এ আমরা গিয়ে উঠি, সেটি ওই তিন দিনের জন্য আমাদের হয়ে ওঠে। রাতে যখন পৌঁছই, তখন অন্ধকার। হালকা করে কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলছে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। কিন্তু রিসর্টের ঘরগুলো পরিষ্কার, ছিমছাম ও আরামদায়ক। আমরা যখন ঢুকে

পড়ি ঘরে তখন সবটা বুঝতে পারিনি। আলো আঁধারিতে জামা কাপড় ছেড়ে, সবাই মিলে বারান্দায় মিট করব ঠিক হয়। রাতটা আড্ডা মেরে কাটিয়ে দেব। আর তাই করলামও। ভোরের আলো যখন ফুটল, চারপাশটা ধীরে ধীরে দেখতে গেলাম। যেন স্বপ্নের দেশ। নদীর পাশে সুন্দরী গাছের সার দেখে অভিভূত হলাম। সুন্দরী গাছ আগে কখনও দেখিনি। শুধু শুনেই ছিলাম তার কথা। নদীর পাড়ে সুন্দরীর সৌন্দর্য না দেখলে বোঝানো মুশকিল। সুন্দরীই তো সুন্দরবনের নামের উৎস। ভোরবেলা আমরা ঘুমোতে গেলাম। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উঠে পড়লাম। লঞ্চ-এ করে জঙ্গলের ধারে ঘুরতে যাব তো! গেলামও সবাই মিলে। সবারই একটা মনে ইচ্ছে বাঘ দেখার। কিন্তু বাঘ বাবাজী অত সহজে দেখা দেয় না। অন্তত সুন্দরবনে তো নয়ই। সারাদিন লঞ্চ-এ ঘুরে বেশ কিছু কুমীর ও অ্যালিগেটর দেখলাম। বড় বড় গিরগিটিও। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ মাঝে মধ্যে ইগুয়ানা দেখেছি, এই গিরগিটিগুলো যেন তারই দেশি ভাই-বোন! সারাদিন ঘুরে বাঘ দেখতে না পাওয়ার ব্যথা ভুললাম যখন রিসর্ট-এ ফ্রেশ মাছ, ভাত খেলাম। ওর স্বাদই আলাদা। দুপুরে অল্প বিশ্রাম করে বিকেলে তৈরি হলাম স্থানীয় একটি শো- দেখতে। এখানকার লোকেরাই নাচ-গান-নাটকের মিশ্রণে তৈরি করেছে তাঁদের জীবন নাটিকা। মধুকরদের জীবন, বনবিবির উপাখ্যান। কী করে বনবিবি ওদের বাঘের হাত থেকে রক্ষা করে, এসবই তারা ব্যক্ত করল। তবে সব কিছুই শেষ হয়ে গেল রাত আটটার মধ্যে। কারণ রাত আটটায় রিসর্ট-এর গেটে তালা পড়ে যায়। এরপর বাইরের কেউ আর ঢুকতে পারে না। রাতে শুধু আমরা, সিকিউরিটি গার্ডরা আর রিসর্ট-এর এক দুজন স্টাফ। আলো বেশি জ্বালাতে পারব না, কোনও ক্যাম্প ফায়ার নয় ; কিছু না দেখতে পেলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিটা আরও শানিত হয়ে ওঠে। রিসর্ট-এর মধ্যে বারান্দায় বসে আমরা জঙ্গলের আরও কাছে পৌঁছে গেলাম। নিস্তব্ধতার মধ্যেই শুনতে পেলাম জলের ছলাৎ ছলাৎ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, তার মাঝে কী একটা পাখির চিৎকার। শিরশির করে অন্যদিকে চলে গেল ছোট কোনও প্রাণী। বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বলল 'নিশ্চয়ই সাপ।' একটু ভয় ভয় করছিল। রিসর্ট-এর যিনি রান্না করেন, তিনি কাছেই ছিলেন। বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। জন্তু জানোয়ার পশুপাখি বিনা কারণে আক্রমণ করে না। মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ জীব।' এরপর উনি যে গল্প বললেন সেটা শুনে খুবই খারাপ লাগল। ওঁদের গ্রামের একটি বাড়িতে ক'দিন আগে ভুল করে পথভ্রষ্ট হয়ে একটি বাঘ ঢুকে পড়ে। গ্রামবাসী তো বাঘের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে লাঠিসোটা, ঢোল, করতাল, টিন বাজিয়ে গ্রাম মাত করছে। আর বাঘটি তত লুকোবার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে কেউ কেউ ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে, আর বেচারি বাঘের গায়ে লাগায় সে হালকা গর্জন করে উঠছে, তাতে গ্রামবাসী আরও উত্তেজিত। এর মধ্যে বনবিভাগের কলোকজন এসে পড়েন। গ্রামবাসীর হাত থেকে বাঘটি উদ্ধার হয়। আসলে মানুষ জঙ্গল কেটে বাঘের বসতি লুঠ করেছে, তাই বাঘটি ভুলে গ্রামে ঢুকে পড়েছিল। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাঘটি নিয়ে যাওয়া হয়, আর পরে শুনেছি তাকে অন্য একটি এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়।

সুন্দরবনের তিনদিনের সফরে আমার বাঘ দেখা হল না, কিন্তু আমরা বন্ধুরা জঙ্গলের সান্নিধ্য যেভাবে উপভোগ করেছি, তা ভোলার নয়। আবার সময় পেলে বন্ধুরা মিলে যাব ঠিক সুন্দরবনে, কে জানে বাঘবাবাজি হয়তো এবার দেখা দেবেন।

বনে যাবো

সায়ন রায় কাঞ্জিলাল

এখনও বলার সময় আসেনি... প্রহর কাটল রাতে...
সব গাছেরা অন্ধকারে স্থির...
আমি তো চেয়েছি এই মৃত জ্যোৎস্নায় ফিরে আসবে
ঘুমের মধ্যে কিছুক্ষণ এ পাশ ওপাশ, তারপর
স্বপ্নের ভিতরে তলিয়ে যেতে
যে জীবন উধাও... ধিকিধিকি জ্বলে জলায়, জঙ্গলে
হাজার অকালমৃত্যু, সৎকার শেষেও মনে পড়ে যায়

সেকথা একদিন বলে যাবো, আমার সে গল্প গোগ্রাসে গিলবে সবাই
সব নিশ্চিহ্নতার অভিসন্ধীতে এই শেষ রাতে ফিরে আসছে যেন
প্রতিশোধ প্রিয় ঝড়, প্লাবনের বৃষ্টি...

গেম

শম্পা বণিক

ওরা গেম খেলে,
বিপদজনক যতো গেম!
আগুনের সাথেও!
সব্বাই তালি বাজায়!

অনেকেই জানে,
আগুনের গেম খেলা।
নিঃসারে দাবানল জ্বেলে
দূর থেকে দেখে
খাক্ হওয়া।

তোমরাও জানো।
তোমাদেরও আঁচ লাগে না,
আমি পুড়ে গিয়ে
আউট হয়ে যাই।

সময়-কোলাজ

তারক মজুমদার

বৃষ্টি ঝরেছিলো দু'চোখে সেদিন
তবুও আসেনি কেউ এগিয়ে,
ব্যথাতুর হৃদয় পাষাণ আজ
ভালবাসা ঠায় মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে।

আজ সবকিছু আলাদিনের প্রদীপ
হাতের মুঠোয় রিমোট, ঐশ্বর্য, নারী,
জ্বালানি শেষে, উড়বে ছাই
প্রগতি চাকা ঘুরছে আমায় বলছো আনাড়ি?

তোমার হাতের মুঠোয় পচা কাদা
স্বপ্নিল মন, সংখ্যাতত্ত্বে আবদ্ধ,
পুঁথিগত বিদ্যা, ভালবাসা হারায়
হক কথা বলি, করোনা কণ্ঠ রুদ্ধ।

আমার না বলা কথা, শব্দ মাধুরী
মন্দাক্রান্তা ছন্দে গর্জে ওঠা তরবারি,
স্মৃতির গভীরে, হানা দেয় হায়না
আমার কবিতা গর্জে ওঠা হাতুড়ি।

নিয়তির টানে, ওরা আঘাত হানে
জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ সোহাগে হাসে চাঁদ,
ভাবনার আকাশে তোমরা ওড়ো
স্মৃতির পাপড়ি খসুক। আমায় দিও বাদ।

বয়সে মা

ডাক্তারের চেম্বারে

উচ্চশিক্ষা, কেরিয়ার গঠন না করে আজকাল অনেক মেয়েই বিয়ে করতে নারাজ। ফলে বিয়ের পিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে বয়স তিরিশ পেরিয়ে যায়। এরপর সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে যদি বয়স ৩৫ এর বেশি হয়ে যায় তাহলে মা এবং শিশু দুজনেরই বেশ কিছু সমস্যার আশঙ্কা থেকেই যায়। যদিও প্রথম থেকে সতর্ক থাকলে এ সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। বেশি বয়সে মা হতে চাওয়া মহিলাদের আশ্বস্ত করলেন গাইনোকলজিকাল এন্ডোস্কোপিক সার্জেন **ডাঃ গৌতম খাস্তগীর**

প্রশ্ন : লেট প্রেগন্যান্সি বা বেশি বয়সের সন্তান বলতে ঠিক কোন বয়সটাকে বোঝায়?

উত্তর : চিকিৎসকদের কাছে ৩৫ বছরের বেশি বয়সে সন্তান ধারণ করলেই লেট প্রেগন্যান্সি বলে বিবেচিত হয়। যদিও ৩৫ এর পর থেকে ৫০ বছর অর্থাৎ মেনোপজের (রজঃ নিবৃত্তি) আগে পর্যন্ত আজকাল অনেকেই 'মা' হচ্ছেন।

প্রশ্ন : বেশি বয়সে বিয়ে হওয়াই কি এর জন্য দায়ী?

উত্তর : বেশি বয়সে বিয়ে হওয়া একটা কারণ ঠিকই, তবে একমাত্র নয়। কম বয়সে বিয়ে হলেও অনেকে পেশাগতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সন্তান নিতে চান না। ফলে বয়স বাড়তে থাকে নিজের নিয়মে। অনেক সময় বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হতে সময় লাগে। এই সময়টাতে সন্তানের জন্ম দিয়ে বাড়তি ঝামেলা বাড়াতে চান না অনেকে। সব স্বাভাবিক হলে তবেই সন্তান ধারণ করব-এই মনোভাবের ফলে বয়স বেড়ে যায়। আজকাল অনেক মেয়েই ডিভোর্সের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করছেন। ফলে পরবর্তী স্বামীর সন্তান নিতে গেলে বয়স যে বেশি হবে তা বোঝাই যায়। কখনও প্রথম সন্তানের শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকার জন্য কিংবা প্রথম সন্তানের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য অনেকে বয়সের কথা না ভেবে সন্তান নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে এও ঠিক, অনেকেই বেশি বয়সেও সুস্থ শিশুর জন্ম দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : কিন্তু অনেকেই যে আবার হতাশ হচ্ছেন। বহু চেষ্টা করে, ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বার বার গিয়ে, অর্থ খরচ করেও কোনও ফল পাচ্ছেন না। এর কারণ কী?

উত্তর : বেশি বয়সে সন্তান ধারণে কিছু কিছু সমস্যার কথা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। এজন্য অনেকটাই দায়ী শারীরবৃত্তিয় কারণ। আসলে প্রতিটা মেয়েই জন্মের সময় দুটো ওভারিতে গড়ে প্রায় ২ কেটি ডিম্বাণু নিয়ে জন্মান। প্রতি মাসে এই ডিম্বাণু নষ্ট হতে থাকে। যদিও এই নষ্টের হার সব মহিলার সমান নয়। কারও তাড়াতাড়ি কারও বা ধীরে নষ্ট হয়। কেউ কেউ স্বাভাবিকের থেকে কম ডিম্বাণু নিয়েও জন্মান। সেক্ষেত্রে তাঁদের আগেভাগেই মেনোপজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার উল্টোটাও হয় কারও কারও ওভারিতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি ডিম্বাণু থাকে। ফলে মেনোপজ (রজঃ নিবৃত্তি) হয় অনেক দেরিতে। এই কারণেই ৪০-৪৫ বছরে সন্তান হওয়াতে কোনও অস্বাভাবিকত্ব নেই।

যদিও মেয়েদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর গুণমান কমতে শুরু করে। ফলে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা কমে যায়। আবার প্রেগন্যান্সি এলেও তা আপনা আপনি অ্যাবরশন হয়ে যায়। এছাড়াও আরও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সব কারণেই অনেককে হতাশ হতে হচ্ছে।

প্রশ্ন : সমস্যা কি শুধু হবু মায়ের?

উত্তর : হবু মায়ের সমস্যা তো আছেই। যেমন এই সময়ে মায়ের রক্তের আয়তন বেড়ে যায়। ফলে হার্টের ওপর চাপ পড়ে। বমি হয়, দুর্বল লাগে, লিভার, ব্রেন, কিডনি প্রেগন্যান্ট অবস্থায় বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে বলে নানারকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডায়াবেটিস থেকে জন্ডিস যে কোনওটাই জটিলতা ডেকে আনতে পারে। মা ছাড়া সন্তানেরও কিছু কিছু ঝুকি থেকে যায়।

প্রশ্ন : গর্ভস্থ সন্তানের কী কী সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : গর্ভস্থ সন্তানের নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। মহিলার বয়স বেশি হলে জরায়ুতে রক্ত সঞ্চালনের পরিমাণ যায় কমে। ফলে মা ও সন্তানের মধ্যেকার রক্তচলাচল কমে গিয়ে বৃদ্ধি ঠিকভাবে হওয়ায় বাধা তৈরি হয়। বাচ্চা ছোট হতে পারে। একে বলে 'ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রিটার্ডেশন'। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের আগেও শিশুর জন্ম হতে পারে। একে বলে 'প্রি-ম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেনস'। স্বাভাবিকের আগে সন্তান হলে তার জীবন সংশয়ও হতে পারে। এছাড়াও শিশুর বিকলাঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এ সব সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকলে। বহু সুস্থ শিশু জন্মাচ্ছে যাঁদের মায়ের বয়স যখন ৪৫-৪৬ তখনও। এহ সব শিশুরা অন্য শিশুদের মতো স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠছে।

প্রশ্ন : সুস্থ শিশু জন্ম দেওয়ার জন্য কী ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

উত্তর : প্রথমত, কাউন্সেলিং। বেশি বয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গেলে কী কী সমস্যা মায়ের এবং সন্তানের হতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া। এরপর যদি সেই মহিলা মা হতে রাজি থাকেন তখন তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করে দেখা হয় সেখানে কোনও সমস্যা আছে কি না। তাঁর ব্লাডসুগার, ব্লাডপ্রেসার, থাইরয়েডের অসুখ, কিংবা হার্ট, কিডনির ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। সব দিক ঠিক থাকলে তখনই এগোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : শিশু যাতে বিকলাঙ্গ না হয় তার জন্যও নাকি এখন টেস্ট বেরিয়ে গেছে?

উত্তর : হ্যাঁ। এখন সন্তান গর্ভে আসার পর নানা রকমের রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং অ্যামনিও সেন্টেসিস পরীক্ষা করে গর্ভস্ত শিশু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা জানা যায়। যদি শিশুর বিকলাঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে গর্ভপাত করানো হয়। ভ্রূণের ২০ সপ্তাহের মধ্যেই এটি করা হয়। তবে একবার শিশুর বিকলাঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, তেমনটাই বার বার হবে ভাবার কোনও কারণ নেই। পরের বার সুস্থ শিশু জন্মাতেই পারে।

প্রশ্ন : বেশি বয়সে মা হতে চাওয়া মহিলাদের কী কী পরীক্ষা

সাধারণত করা হয়?

উত্তর : ওই বয়সের মহিলাদের শরীরে ডিম্বাণু তৈরির ক্ষমতা কেমন, ফ্যালোপিয়ান টিউবে কোনও সমস্যা আছে কি না কিংবা স্বামীর উপযুক্ত পরিমাণে স্পার্ম আছে কিনা এবং এর কার্যক্ষমতা কতটা তা দেখা হয়। যদি সব ঠিকঠাক থাকে তবে নিয়মিত সহবাসের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গর্ভধারণ সম্ভব। তা না থাকলে নেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন বা আই ইউ আই, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আই ভি এফ বা টেস্ট টিউব বেবি কিংবা ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন হল সাহায্যকারী ব্যবস্থা। ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন-এর সাহায্যে ওষুধ দিয়ে ডিম্বাণু তৈরি করে গর্ভধারণে সাহায্য করা হয়। তাড়াতাড়ি সন্তান নিতে হলে আই ভি এফ-এর সাহায্য নিতে হয়। যদিও এছাড়া কখনও কখনও অন্যের ওভাম নিয়েও প্রেগন্যান্সি আনার চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্ন : যে কেউ কি ওভাম দিতে পারে?

উত্তর : ওভাম ডোনেশনের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের গায়ের রঙ, উচ্চতা, ওজন শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা হয়। যদিও ওভাম দানের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও আছে। বিশেষ করে যদি দাতা ও গ্রহীতা পরস্পরের পরিচিত হন। সন্তান জন্মানোর পর দাতার মনে তার প্রতি কিছুটা অধিকার বোধ জন্মায় যা থেকে বড় সড় অশান্তি বাধতে পারে দুই পরিবারে। তাই অচেনা, অজানা মহিলার অর্থাৎ আননোন ডোনেশন বা অ্যানোনিমাস হওয়াই ভাল।

প্রশ্ন : সাহায্যকারী ব্যবস্থায় সন্তানগর্ভে আসার পর কি কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন হয়?

উত্তর : অবশ্যই। হবু মায়ের এবং সন্তানের সুস্থ থাকার জন্য ধারাবাহিক পরীক্ষার প্রয়োজন। প্রথম দিকে সন্তানের বিষয় জানার জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়। ৭-৮ এবং ১১-১২ সপ্তাহে শিশুর সার্বিক বৃদ্ধি জানতে নিউকাল ট্রান্সলুসেন্সি বা এন টি স্ক্যান, অঙ্গপ্রতঙ্গের বিষয়ে জানতে ১৮-২০ সপ্তাহে অ্যানাটমি স্ক্যান, ২৪ সপ্তাহে কার্ডিয়াক স্ক্যান করে হার্টের গঠন কেমন জানা হয়। ১১-১২ সপ্তাহে ডাবল মার্কার এবং ১৫-১৬ সপ্তাহে ট্রিপল মার্কার নামে রক্তের পরীক্ষা করা হয়। কোনও অস্বাভাবিকতা নজরে এলে কোরিওনিক সিলাস বায়োপসি করে ক্রোমোজোম ঘটিত সমস্যা আছে কিনা দেখা হয়। ১৬-১৭ সপ্তাহে করা হয় অ্যামনিওসেন্টাসিস পরীক্ষা। এছাড়া ২০ সপ্তাহ পর থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর পরীক্ষা করা হয়।

উত্তর কলকাতায় প্রথম কিডনির অসুখে উন্নত প্রযুক্তিগত

লেজার সার্জারি

LASER SURGERY
HOLMIUM

@Eskag SANJEEVANI Bagbazar

	TURP	LASER
1 Invasiveness	Minimum	Minimum
2 Post operative Pain	Minimum Pain	Painless
3 Energy used	Electric	Laser beam
4 Hospital Stay	More	Less
5 Resume normal Activities	Late	Early
6 Blood Loss	Yes	Negligible
7 Sexual side effect	Present	Nil
8 Anticoagulant taking Pt	Need to stop	No need to stop
9 Normal saline resection	Not possible	Possible

২৪x৭ দিন একই ছাদের তলায় পাবেন
সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ও অসুখ অনুসন্ধান পদ্ধতি

সিটি স্ক্যান

মাল্টি স্লাইস

+ এমারজেন্সি
+ ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট
+ ডায়ালিসিস
+ কম্পিউটার চালিত প্যাথলজিকাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
+ আধুনিক অসুখ নির্ণয় প্রযুক্তি

- খরচ আয়ত্ত্বের মধ্যে
- হাসপাতালের রোগী বা অনুন্নত শ্রেণীর রোগীদের জন্য পি পি পি রেট চালু
- গত কয়েক বছর সরকারি ও সরকারি আন্ডারটেকিং সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে জড়িত

Renew life afresh

Eskag SANJEEVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL

ESKAG SANJEEVANI PVT. LTD.

For any kind of Information/Assistance
Please Feel Free To Contact Ph: 4025 1800,2554 1818(20 Lines)
Website: www.eskagsanjeevani.com /E-mail: info@eskagsanjeevani.com

অশান্ত সমুদ্র

অনিশা দত্ত

‘হ্যালো!’ শ্রুতি রিসিভার তুলল। ওপাশে শরতের সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। ‘কী খবর, ম্যাডাম? রিজার্ভেশন হয়েছে?’ ‘বাঃ, রিজার্ভেশন তো আপনার করার কথা ছিল।’

‘তাই কি? শেষ পর্যন্ত তো, সাহেবই করবেন বললেন।’ যেহেতু প্রতীক খানিক সিনিয়র, শরৎ, প্রতীককে ‘সাহেব’ সম্বোধন করে থাকে। শ্রুতির মতে, শরৎ সার্থকনামা। শরতের আকাশের মতোই নির্মল।

‘কী জানি, ঠিক মনে করতে পারছি না। আমাকে বললেন, ‘আমারও কেমন যেন ধারনা ছিল, আপনিই করছেন। যাক গে আমি এখনই দেখছি!’ শরৎ ফোন নামাল।

আধঘণ্টা পর আবার কি রি রিং-কি রি রিং। শ্রুতি দৌড়ে এসে ফোন ধরল, ‘হ্যালো!’ এত ভয়ানক ভারি গলা শরতের! প্রথম প্রথম কানে ভার বোধ করত শ্রুতি। এমন গভীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুতি আগে শোনেনি। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। ‘শুনুন ম্যাডাম! আগামী পঁচিশ দিনের মধ্যে খালি নেই। সব বুকড।’ প্লান হতাশ স্বর ফুটল শ্রুতির কণ্ঠে ‘সে কী! তবে কি যাওয়া হবে না?’ শরৎ সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চার হল, ‘তাই আবার হয় নাকি! যাওয়া হবে না মানে? যেতেই হবে। আমাদের এত দিনের মেন্টাল প্রিপারেশন। আপনি সাহেবকে ফোন করুন, অফিসে চেনা জানা ছিল যে ওঁর।’

‘কোথায়? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। এক্ষুনি ফোন করছি। কিন্তু ফোন করে হবেই বা কী! সত্যিই যদি হোটেলে জায়গা না থাকে! চেনা-জানা লোক করবেই বা কি! যাদের রিজার্ভেশন রয়েছে, তাদের তো আর বার করে দিতে পারবে না।’

‘আহা, তা কেন! ক্যানসেলেশনও তো হয়!’ ‘সেটা তো প্রব্যাবিলিটি, না-ও তো হতে পারে। আমরা নববর্ষ উদযাপন করতে না পারি, না হয় পঁচিশ দিন বাদেই যাবো। আপনি আর্লিয়েস্ট পসিবল ডেটে বুক করুন!’ ‘না, আমরা বছরের প্রথম দিনই বার হবো। চান্দিপুর না হয়, বকখালি, কিংবা দীঘা। মোটামুটি যাবই যাব। আমি বারোটার পর, আবার বুকিং অফিসে যাচ্ছি। তখন আরেকবার খোঁজ করতে বলেছে।’

‘যা হোক, আপনাকে একটা কথা আগে-ভাগেই বলে রাখি। ওখানে গিয়ে আমরা একসঙ্গে জলে নামব তো?’

‘ওরে বাবা, ডুবে যাব যে!’

‘বার বার, সমুদ্রে গিয়ে চান করবো না! দরকার নেই যাওয়ার।’

‘আপনি যে চান-চান করছেন, সাঁতার তো জানেন না!’

‘তাতে কি! আপনি তো জানেন। আপনার সঙ্গে নামবো। কী নামবেন না জলে?’

‘নামবো।’ ‘জেনে রাখুন সমুদ্রে গিয়ে সকলেই জলে নামে। এবং আমরা একসঙ্গে নামবো। কিন্তু আপনি যদি একসঙ্গে জলে নামতে শেকি ফিল করেন, তবে এখনও বলছি, বুকিং-এর দরকার নেই। ওখানে গিয়ে হতাশ হতে পারবো না। তার চেয়ে যাবই না।’

‘নামবো, নামবো, একসঙ্গেই নামবো। তারপর ডুববো!’ শ্রুতি ফোন নামাল।

গরমের নিঝুম দুপুরে ঘুম-ঘুম ঢুল নেমেছে শ্রুতির চোখে। ঝনঝনিয়ে ফোন বাজল। বিছানার পাশেই ফোন। আবার সেই ভারী গলার আঘাত, ‘শুনুন বৌদি, হয়ে গেছে রিজার্ভেশন। দুটো সুইট। একটায় আপনারা অন্যটায় আমরা।’

‘সত্যি!’ সমস্ত শরীর-মন ঝলমলিয়ে উঠল শ্রুতির, ‘ওখানে গিয়ে কিন্তু দুবেলা চান। মনে থাকে যেন।’

‘ঠিক আছে, বাবা।’

‘আমরা কিন্তু ফুললি এনজয় করবো।’

‘আমার দিক থেকে কোনও অসুবিধে নেই।’ সোচ্চার হল শরৎ।

‘আজ আসছেন না কি?’

‘নিশ্চয়ই। কী কী সঙ্গে নিতে হবে, একটু কথা বলে আসবো। কতদিন বাইরে বেরোইনি। গত তিন বছরে ছুটি বলে কোনও বস্তু নেই আমার।’

সন্ধ্যেবেলা শরৎ যখন এল, প্রতীক তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। শ্রুতি একা। শরৎ ঢুকেই বলল, ‘আজ আপনাকে খুব ফ্রেশ লাগছে!’

মনে মনে হাসল শ্রুতি। অতি-ভদ্র, অতি-শান্ত, অতি-লাজুক শরৎ মুখ ফুটে বলতে পারবে না, ‘সুন্দর দেখাচ্ছে।’

শ্রুতি ইচ্ছা করলেই, শরতের এই আধো-আধো কথা নিয়ে টিজ করতে পারে। ইচ্ছাও করে খুব। কিন্তু সংযত হয়। মায়া হয়, বেচারিকে বিপর্যস্ত করতে পারে না। এমনিতেই তো নিজেকে শামুকের খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। অনর্থক আরও ভয় পাইয়ে কী হবে! শরৎকে যা দেওয়া দরকার, তা হল সাহস!

শরৎ বলে চলে, ‘সোমবার সকালে রওনা। রবিবার সারা রাত ট্রেন জার্নি করে, বাড়ি পৌঁছতেই প্রায় সাতটা বাজে। এর মধ্যে ঘণ্টা দুই ট্রেন লেট হলে তো, কথাই নেই। আমার জন্য সকলের দেরি হয়ে যাবে। আপনারা যদি ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়েন, আমি না-হয় সোজা এখান থেকে চান্দিপুর চলে যাব।’

‘পাগল নাকি!’ এক কথায় প্রস্তাব নাকচ করে দিল শ্রুতি। মনে মনে গজরাল ‘ইস্! ছ-সাত ঘণ্টার জার্নি, আমি বুঝি গাড়িতে পাশে বসে যাব না?’ শরৎকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে, শ্রুতি তার হাতে একটা খাম দিয়ে বলল, ‘সকলের সামনে তো দেওয়া যাবে না। তাই নববর্ষের দুদিন আগেই দিয়ে রাখলাম।’

হাতে নিয়েই খুলতে যাচ্ছিল শরৎ। শ্রুতি বাধা দিল, ‘না, এখন নয়। গাড়িতে বসে, কিন্তু বাড়ি পৌঁছবার আগে খুলবেন।’

হাত দিয়ে শক্ত ঠেকছে। শরৎ বুঝল ভেতরে কার্ড রয়েছে। শ্রুতি গেট বন্ধ করে, ওপরে চলে গেল। গাড়ির আলো জ্বেলে, খাম খুলল শরৎ। কী সুন্দর সুন্দর কার্ড বেরিয়েছে আজকাল। নাইলনের পাতলা হলদে পাপড়ির মস্ত ফুল, সূক্ষ্ম জড়ির পাড়

দেওয়া। লেখা আছে, 'শরৎকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। —শ্রুতি।' ওইটুকু! হতাশ হল শরৎ! সে কী আশা করেছিল, লেখা থাকবে 'ভালবাসা নাও।'

নতুন বছরের প্রথম সকাল। শ্রুতি প্রস্তুত হয়ে জেনে নিল শরৎ বাড়ি ফিরেছে, তার কাজের জায়গা থেকে। এখন সকাল সাতটা অতএব, সাড়ে-সাতটায় গাড়ি নিয়ে বেরোল তারা। শরৎদের বাড়ি পৌঁছিয়ে, প্রতীকের নির্দেশ মতো তাদের ও শরৎদের সুটকেস, ঝোলা ব্যাগ, জলের বোতল ইত্যাদি জায়গামতন গুছোতে থাকল ড্রাইভার।

মেয়ে রিন্টির হাত ধরে কনক আগে বেরিয়ে এল। শেষে বেরোল শরৎ। শ্রুতির উদ্দেশে বলল 'হ্যালো!' 'হাই!' উত্তর দিল শ্রুতি।

শ্রুতির হিসাবে ভুল হয়ে গেল। সে নিশ্চিত বসার ব্যবস্থায় সে আর শরৎ পাশাপাশি বসবে। কারণ প্রতীকের ঘাড়ে ব্যথা এবং রোদের তাতে তার চট করে মাথা ধরে যায়। গাড়ির সামনের সিট-এ বাঁদিকে সে বসবে না। রিন্টি ছোট, সে নিশ্চয় তার মায়ের পাশে বসতে চাইবে। অতএব, কনক-রিন্টিও পিছনে। বাকি শ্রুতি আর শরৎ অবশ্যই তারা দুজন সামনে বসবে। কিন্তু তা বাস্তবে ঘটল না।

রিন্টি আগে ভাগেই গাড়িতে বসে গেছে পিছনের সিটে। শ্রুতি ভদ্রতা দেখিয়ে দরজা খুলে, কনককে মেয়ের পাশে উঠিয়ে দিয়ে প্রতীককে ওঠার নির্দেশ দিয়ে, যে মুহূর্তে ঘোষণা করল, 'আমি সামনে বসছি', সেই মুহূর্তে কনক ছিটকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি সামনে বসছি।' বলেই শরতের পার্শ্ববর্তিনী হল সে।

হতবাক শ্রুতির নতুন বছরের প্রথম সকাল ত্রিশ শতাংশ মাটি হয়ে গেল। ভাবল, কনকের একী আদিখ্যেতা! তারা কেউ হানিমুনে যাচ্ছে না যে বরকে সবসময়ে বগলদাবা করে রাখতে হবে। দীর্ঘ ছ সাত ঘণ্টার জার্নির শুরুতেই শ্রান্ত হয়ে পড়ল শ্রুতি। কনকের মেয়ে সানন্দে শ্রুতির কোল ঘেঁষে এল।

শরৎ বারে বারেই পিছন ফিরে শ্রুতিকে চিয়ার আপ করার চেষ্টা করছিল। পথের দুপাশের গাছপালা শ্রুতির কতটা পরিচিত? দেখা গেল, গাছপালা চেনে শরৎই বেশি। শ্রুতি একেবারে আনাড়ি নয়। প্রতীক একটাও ঠিক বলছিল না। কনক চুপ ছিল।

চান্দিপুরে পৌঁছিয়ে নিজেদের ঘরে স্থিতু হয়ে, বারান্দায় বেরিয়ে দেখা গেল, জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। হোটেলের আঙিনায় জল। ঢেউ-এর দাপাদাপি। উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিও উদ্বেল হল। শরৎ পাশেই দাঁড়িয়ে। শ্রুতি মনে মনে বলতে চাইল, এখন তো আমাদের চান করতে যেতেই হবে। তার আগে সমুদ্রে নামলে হয় না, একবার। কিন্তু কিছুই না বলে, শুধু শরতের চোখে চোখ রাখল।

গাড়ি থেকে নামা মাত্তর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার বয়স বোধ হয় তারা দুজনেই পার হয়ে এসেছে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দেখে, সাগরের জল সরে যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি সরছে। সাগর গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। ভিজে বালিতে ঢেউ-এর দাগ রেখে রেখে, সমুদ্র পালাতে লাগল। একী আশ্চর্য ব্যবহার। সরতে-সরতে, পিছু হটতে হটতে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই ওদের বোকা বানিয়ে সমুদ্র চলে গেল দেড় কিমি দূরে। শরৎ বলল, 'ভালই হল। আমরা তো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না, চান করব কী না! তাই সমুদ্র নিজেই পিছিয়ে গেছে!'

শ্রুতি ভাবল, সে সিদ্ধান্ত না নিলে, শরৎও কি পিছিয়ে যাবে? নিজে থেকে এগিয়ে আসবে না? এখান থেকে দূর সমুদ্রে তাকালে মনেই হয় না, এই মাত্তর একটু আগে, এই সমুদ্রের ঢেউই হাজার হাজার সাপের ফণা উঁচিয়ে নেচে-ঝেঁপে একাকার করে গেছে। আর এখন, সে যেন সুদূরের পটে আঁকা ছবিটি। জানা গেল, দুপুর সাড়ে-এগারোটা নাগাদ, সমুদ্র ঘণ্টা খানেক তার উত্তাল তরঙ্গমালা নিয়ে হোটেলের নিচে মাতামাতি করে যায়। স্নান করতে চাইলে, সকলে তখনই স্নান করে নেয়।

বাথরুমে স্নান সেরে, সবাই ডাইনিং হলে জড়ো হয়েছে। লাঞ্চের টেবিলে কী ভাগ্যিস, শরৎকে শ্রুতির পাশে বসতে দিতে আপত্তি হল না কনকের। অবশ্য অন্য বিকল্পও ছিল না। রিন্টির পাশে মা না-থাকলে তার ভাল করে খাওয়া হবে না। অতএব, খাওয়ার টেবিলে কনক আর শরৎকে পাকড়াও করতে পারল না। একে একে টেবিল ছাড়ার ফাঁকে, শ্রুতি একান্তে শরৎকে শুধিয়ে নিল 'কী, ক্লান্ত? দুপুরে ঘুমোবেন?'

'পাগল! একেবারে রাতে ঘুমোব।' দুপুরে তাস খেলা হবে। নাকি বিচে ঘুরতে যাবে, ভাবতে ভাবতে নিজেদের ঘরে পৌঁছিয়ে আলাদা হয়ে গেল তারা।

শরৎকে সিগারেট ধরাতে দেখে। কনক বলল, 'কী হল ঘুমোবে না? কাল সারারাত জার্নি করে ফিরেছো!'

'নাঃ, ঘুম পায়নি!' শরৎ সংক্ষিপ্ত হল।

কনক ঝাঁঝালো, 'ঘুম পায়নি, আবার কি! একটু শোও!'

অগত্যা। শরৎকে শুতে হল পাশে। কনক মেয়েকে কাছে টানেনি। কিন্তু শরৎকে ধরে রাখল। পাশের ঘরে প্রতীক ঘুমিয়েই পড়েছে। শ্রুতিও শুয়ে পড়ল। একটু পরে, সেও আর চোখ খুলে রাখতে পারল না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, টেরই পেত না যদি না রিন্টি এসে ডাকত, 'কাকিমা, আমি বিচে যাচ্ছি। মা-বাবা ঘুমোচ্ছে, তুমি বলে দিও।' ধরমড়িয়ে উঠে বসল শ্রুতি, 'না-না একা যাবে না। আমি যাচ্ছি, দাঁড়াও।'

মেয়ে কথা কানে নিল না। শ্রুতির ঘরের মধ্য দিয়ে অন্য দিকের দরজা খুলে, দৌড় দিল। পিছনে পিছনে শ্রুতিকে ছুটতে হল অগত্যা। বিচে যাওয়ার পথ সম্ভবত শরতের ঘর থেকে নজরে আসে। রিন্টি এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শরতের উদ্বিগ্ন গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শ্রুতি। 'একী কোথায় যাচ্ছ? একা একা?'

রিন্টি উত্তর দিল, 'একা নয়, কাকিমা রয়েছে।' পরক্ষণেই বোধহয় শরৎ শ্রুতিকে নজর করল। কারণ তার কণ্ঠে 'ওঃ আচ্ছা...' এই কথাদুটি শ্রবণে পৌঁছল শ্রুতির। কিন্তু সে ঘুরে তাকাল না। মনে ভাবল, সে বিচ-এ যাচ্ছে, এই খবরটুকুই শরতের কাছে যথেষ্ট হওয়া উচিত। ফিরে তাকানো নিষ্প্রয়োজন। আগ বাড়িয়ে ডাকাটাও বাহুল্যই। নিশ্চিন্ত হয়ে, নিশ্চিত হল শ্রুতি। এইবার শরৎ আসবে।

শরতের গলার জোরে, ঘুম চটকে গেল কনকের। সে বিরক্ত স্বরে বলল, 'চেঁচাচ্ছ কেন? শুয়ে পড়ো না।' 'না, মেয়েটা একা একা বিচে ছুটল! অবশ্য বৌদি সঙ্গে গেছে।' 'তবে আর কি, ঘুমিয়ে নাও। কাল সারা রাত নিশ্চয়ই ট্রেনে ঘুম হয়নি?' অগত্যা শরৎ শুয়ে পড়ল। শ্রান্ত শরীর, ক্লান্ত চোখ আর বশে রইল না!

শ্রুতি রিন্টির সঙ্গে ভিজে বালিতে পায়ে পায়ে হেটে এগোচ্ছে, দূর সমুদ্রের দিকে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, এই বুঝি শরৎ আসে। ধীরে ধীরে হাটতে হাটতে, সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেল দুজনে, হোটেল থেকে অনেকটাই দূরে। উত্তাল সমুদ্র, উদভ্রান্ত উর্মিমালা। পড়ন্ত রোদের উজ্জ্বল ঝিকিমিকিতে উত্তেজিত উৎসুক কনিকা কন্যা আর উন্মনা শ্রুতির উদাস চাহনি, শরৎ এলো না।

কিছুক্ষণ ঝিনুক কুড়িয়ে হোটেলে ফিরে এল তারা। রিন্টি ফিরে এসে আবার খবর দিল, 'মা-বাবা ঘুমোচ্ছে।' অতঃপর শ্রুতির

ঘরে একাই খেলতে বসে গেল সে। প্রতীক ঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিছানায় এক কোণে শুয়ে পড়ল শ্রুতি।

প্রতীকের ঘুম ভাঙতেই সে চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী? হল কিছু? রোম্যান্স?'

'সব সময়ে ঠাট্টা ভাল্লাগে না।' বিরক্ত হল শ্রুতি।

'খুব ভাল্লাগে, বলো না, এক সঙ্গে বেড়ালে?'

শ্রুতির স্বরে উষ্মা ফুটল, 'সব ঘুমোচ্ছে।'

'আহা-হা, জাগিয়ে দাও। হে মাধবী দ্বিধা কেন, আসিবে কি। ডাকিবে কি, ফিরিবে কি? ডেকে তোলো। দরজায় নক করো।'

'তুমি করো' শ্রুতি রেগে-মেগে বাথরুমে গেল চোখ মুখ ধুতে।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে, বিচের ধারে বসে চা খেল সবাই। শ্রুতি ছাড়া, রাস্তার ধারে চা-খাওয়া তার অত্যন্ত অপছন্দ। কোল্ড ড্রিংকস তার ভাল লাগে না। ডাব বিক্রি হচ্ছে ঢেলে। প্রতীক উৎফুল্ল হয়ে, ডাবের অর্ডার দিল। শ্রুতির ডাব খাওয়াটা পারিবারিক ঠাট্টার পর্যায়ে। কলেজস্ট্রিটে দশ টাকা করে একখানা ডাব। শ্রুতি যখনই পারে কলেজস্ট্রিটে যায়, দশখানা করে ডাব উঠিয়ে আনে গাড়িতে। সারা সপ্তাহ খায়। দুপুরে শরৎ এলে তাকেও অফার করে। দোকানটার বোর্ডে লেখা ছিল গ্রিন কোকোনাট পাঁচ টাকা। অতএব সহজেই সম্মতি দিল শ্রুতি। সবাই খাচ্ছে এরপর। প্রতীক দাম দিতে গেলে, জানা গেল একেকটা বারো টাকা। দারুণ চটে গেল শ্রুতি। একী ঠকবাজি! চান্দিপুরে আর সে ডাব খাবে না।

প্রতীক বলল, 'দোকানের সাইনবোর্ড দশবছর আগেকার। আচ্ছা, ডাবওলার সঙ্গে একটা রফা করা যাক। শোনো, তুমি কুড়ি টাকায় দুটো ডাব দাও, একটার দাম বারো টাকা, অন্যটা আট টাকা। শ্রুতি, আট টাকারটা খাবে, আমি বারো টাকারটা।'

শ্রুতি হেসে ফেললেও, আর ডাব খেতে চাইল না। রিন্টি প্রতীকের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, হোটেলের দিকে। শরৎ চায়ের দাম মিটিয়ে আসতে, এত দেরি করল, ওরা তিনজনে হোটেলে পৌঁছিয়ে দেখল, সমুদ্রের দিকের বাগানের গেটে তালা। মেন গেটে যেতে হলে, আবারও ঘুরে বড় রাস্তায় যেতে হবে। কনক বলল, 'আসুন দিদি, গেট টপকিয়ে ঢুকে পড়ি।'

পাশের চা-দোকানের মালকিন বাধা দিল, 'একদম নয়। লোহার শিক, পাশে কাঁটাতার, একজনের গত বছর অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে, গেট টপকাতে। এদিকে আসুন। নিচু পাঁচিল, কাঁটাতারের বেড়া নেই।'

শরৎ ঝপ করে পাঁচিল ডিঙিয়ে গেল। কনক পাঁচিলে উঠতে যেতেই, শরৎ বলল 'ধরব নাকি?'

'আমাকে ধরতে লাগে না।' প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুর কনকের কণ্ঠে। শ্রুতির মনে হল কনক তাকে আগে থেকেই সাবধান করছে। শ্রুতির পালা এলে, শরৎ তাকেও প্রসারিত হাতের আহ্বান জানাল। যদিও শ্রুতি একেবারেই নির্ভীক ছিল না, তবু অসম্মতি জানাল। তার মনে হল, কনক হয়তো মনে করবে, তার অধিকারে হাত বাড়াচ্ছে শ্রুতি।

যাই হোক লঙ্ঘন পর্বের শেষে যে চা-দোকানের মালকিন টর্চ ধরেছিল এইবার, টর্চ নিভিয়ে সে ঘোষণা করল, 'যে কদিন থাকবেন সকাল-বিকেল আমার এখানে চা খেতে হবে, কিন্তু।' শ্রুতি হেসে সায় দিল।

রাতে খাওয়ার টেবিলেও বসার বন্দোবস্ত একইরকম। শ্রুতি কৃতজ্ঞ হল, কনক, খাওয়ার টেবিলে শরৎকে তার পাশে অ্যালাউ করছে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর, বারান্দায় চেয়ার পেতে কনক শ্রুতি আর শরৎ বসেছে। রিন্টি সারাদিন হুটোপাটি করে ক্লান্ত, শুয়ে পড়েছে। প্রতীক চিরকালই 'আর্লি টু বেড অ্যান্ড লেট টু রাইজ'—এই আপ্ত বাক্যে বিশ্বাসী। শরৎ, কনক কেউ নাকি রাত একটার আগে শোয় না। কারণ, শরৎ বাড়ি ফেরে রাত এগারোটায়, খেতে বসে বারোটায়।

রাতে সমুদ্রে আবার জোয়ার এসেছে। হোটেলের অনেক কাছে জল থৈ থৈ করছে। গর্জাচ্ছে সমুদ্র। কনক বার বার বলতে লাগল, 'চলো নিচে যাই।' শরৎ একেবারেই প্রস্তাব নাকচ করল। শ্রুতিও উৎসাহ দেখাল না। বলল, 'আবার এই অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢোকা, খুব রিস্কি!' তবু, কনক মাঝে মাঝেই নিচে যেতে চাইছে, আর শরৎ অসম্মতি প্রকাশ করছে।

দাম্পত্য বিসম্বাদে শ্রুতি নাক গলাল না। মনে ভাবল, শুধু যদি সে, আর শরৎ যেতে পারত, না হয় ভেবে দেখত। এগারোটা নাগাদ, শুভরাত্রি জানিয়ে সে নিজেদের ঘরে শুতে চলে গেল। শরৎ আর কনক আরও কিছুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। শরৎ হঠাৎ চেয়ার ছাড়তেই, কনক বলল, 'কী হল? এখনই শুতে যাচ্ছ?'

'না ভারি ক্লান্ত লাগছে। কাল সারারাত টেনশনে ঘুমোতে পারিনি, ঠিক সময় মতো পৌঁছতে পারব কী না, সর্বদা চিন্তা ছিল।'

'ওঃ দুপুরে তো ঘুমোলে! নাকি ঘুমোও নি?' কণ্ঠে শ্লেষ ফুটল কনকের।

'ঘুমিয়েছি সামান্য। কাল বরং ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখা যাবে।'

নিয়মমাফিক দৈহিক ঘড়ির এ্যালার্মে শ্রুতি বিছানা ছাড়ল ভোর সাড়ে পাঁচটা। সমুদ্রের ধারে সকালের মোলায়েম নরম আলো। কিন্তু সূর্য উঠে গেছে। আকাশের গায়ে, অনেক উঁচুতে। সূর্যোদয় দেখা হল না। না হোক, এখনও দুটো ভোর রয়েছে। শ্রুতি বারান্দায় এল, বারান্দা ফাঁকা দেখে ভাবে, পাশের ঘরের বাসিন্দারা বিছানা ছাড়েনি। কোনও সাড়াশব্দ আসছে না। বারান্দার দিকের দরজা খোলা। তবু দরজার সামনে দাঁড়াতে বা জানলা দিয়ে ডাকতে সংকোচ বোধ করল সে। মনে হল, তাদের দাম্পত্য জীবনে উঁকি দেওয়া হবে।

হোটেলের সার্ভিস যারপরনাই আপত্তিকর। কেউ অ্যাটেন্ড করে না। ঘর অপরিষ্কার থাকে। শ্রুতির মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কিন্তু সে স্থির করে এসেছে, এই তিনটে দিন সে শান্ত থাকবে। কোনও রকম কনফ্রন্টেশনে যাবে না। মনোমতো প্রাতরাশ না পেলেও, শান্ত রইল।

প্রাতরাশের পর দূর সমুদ্রের উদ্দেশে রওনা হল তারা। এখনও বালি শুকনো। কাল রাতে জোয়ারের পর, সমুদ্র ফিরে গেছে দূরে। যেন শান্ত ছবিটি। আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল সবাই। রিন্টি ছুটে ছুটে এগিয়ে চলেছে। শান্ত সমুদ্র, এখন ভাঁটার সময়। প্রতীক বলল, 'এখনই স্নান করে নেওয়ার সুবিধা। জোয়ার এলে, আমরা নিজেদের সামলাতে পারব না।'

শ্রুতি মনে মনে বলল, 'তবু, সামলাতে হয়।'

জলে নামবে বলে, শ্রুতি সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে। আসার আগের দিন, কনকের বাড়ি গিয়েছিল শ্রুতি, বলেছিল 'দু-সেট সালোয়ার কামিজ নিয়ে নিও।'

কনক মুখ ভার করে জানিয়েছিল, 'আমি শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরি না। সালোয়ার কামিজ নেই।'

শ্রুতি পাল্টা জবাব দিয়েছিল, 'এখন তো কেনার সময় নেই, আমি তোমার জন্য একটা স্পেয়ার নিতে পারি। ফিটিংস হয়তো হবে না। তবে, কাজ চলে যাবে।'

'আচ্ছা নেবেন।'

শ্রুতি বাড়তি সেট এনেছিল, পৌঁছিয়ে কনককে দিয়েও দিয়েছে। কিন্তু কনক পরেনি। শাড়ি পরে বেরিয়েছে। শান্ত সমাহিত সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছিয়ে, চমৎকার প্রশান্তি লাগল শ্রুতির। ঢেউ আছে, তাও শান্ত অচঞ্চল। এই শরতের মতোন। সবচেয়ে যা চমৎকার, তা হল সমুদ্রের এই পাড়টা জনহীন। সকলেই জোয়ার জলে হোটেলের আঙিনায় স্নান করে। ঝপাঝপ সবাই জলে নামল। প্রতীক আর শরৎ পাজামা পাঞ্জাবি ছেড়ে, শর্টস পরেছে।

অনেকটা অবধি গেলে, তবে গলা জল। প্রতীক জলের ব্যাপারে ঝুঁকি নেবে না। সে তার কোমর জলে নিরাপদ গভীরতায় স্থিতিশীল। রিন্টি ভয়ে ভয়ে বেশি দূর এগোয়নি। শরৎ আর কনক ছাড়া, বাকিরা সাঁতার জানে না। শ্রুতি লক্ষ্য করল, কনক শরৎ-এর কাছাকাছি থাকছে। কিছুতেই সরছে না। অথচ, স্বাভাবিক নিয়মে তার তো রিন্টির কাছাকাছি থাকার কথা। শরৎ প্রথমে রিন্টিকে কাছে ডেকে ডুব দেওয়াল। হাত ধরিয়ে, খানিক সাঁতারও প্র্যাকটিস করাল। তারপর ডাকল, 'আসুন বৌদি, আপনাকে ডুব দিইয়ে দিই।'

হাত বাড়িয়ে শরতের দুই হাত ধরল শ্রুতি। শরৎ হেসে বলল, 'ভয় কি ডুব দিন।' শ্রুতি ডুব দিল মাথা তুলল। শরৎ ঘাড় নেড়ে হেসে বলল, 'হল না, হল না, উটের মতোন হচ্ছে। ভাল করে ডুব দিন। অন্তত তিনবার।'

মাটির তলা থেকে পা সরে গেল শ্রুতির। হাবুডুবু খেল। লোনা জল গিলে একাকার। শরৎকে ছেড়ে সরে গেল শ্রুতি। শরৎ কিছুক্ষণ মেয়েকে অ্যাটেন্ড করে, আর মাঝে মাঝে শ্রুতিকে ডাক দেয় 'আসুন বৌদি, ডুব দিন।' শ্রুতি গিয়ে হাত ধরে, কিন্তু মন ভরে না। শান্ত সমুদ্রে, অশান্ত শ্রুতির বুক তোলপাড় করে।

শরৎ হেসে বলে, 'সাঁতার শেখেননি তো, জীবনটা ষোলোআনাই মাটি।' মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল শ্রুতি, কথাটার যথার্থ। সাঁতার জানলে কি শরতের হাত ধরে ক্ষান্ত থাকত? জলের তলায় সোজা শরৎকে জড়িয়ে ধরত। শরৎ ফাঁকে ফাঁকেই শ্রুতিকে আহ্বান জানাচ্ছে। আর কনক ফাঁকে ফাঁকেই শরৎকে আব্দারের সুরে বলছে, 'আমাকে দূরে নিয়ে চল, সাঁতার দেবো।'

শরৎ বলে, 'পাগল নাকি. জোয়ার আসার সময় হচ্ছে।'

এত কাছাকাছি সর্বাঙ্গ সিক্ত সুঠাম উদ্ধত শ্রুতির শরীর। শরৎ শুধুই হাত ধরে রয়েছে শ্রুতির। শ্রুতি ডুব দিচ্ছে, লোনা জল গিলছে আর হাসছে। শরতের শান্ত সমুদ্রে জোয়ারের কল্লোল অশান্ত ঢেউ জাগছে। ঝাঁপা ঝাঁপি করছে বক্ষ জুড়ে। সেই ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছড়ে পড়ছে শ্রুতির বুকে। শরৎ বলে উঠল, 'বৌদি, আপনার কপালের টিপ্, নাকের ডগায়।'

হাসল শ্রুতি 'আমি তো নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছি না।'

'মাথায় লাল কী পরেছেন? কী সুন্দর! কোথায় পাওয়া যায়?'

'বাঃ, বেদিং ক্যাপ্। স্যুইমিং স্যুটের প্রশ্ন নেই। সাঁতারই জানি না। তাই শুধুই টুপি।' ভিজে সালোয়ার কামিজ শ্রুতির শরীর ঘিরে খাঁজে-ভাঁজে সাপটে রয়েছে। শরতের চোখের তৃষ্ণা হাহাকার করছে। সে সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। মনে ভাবছে, স্যুইমিং স্যুটে শ্রুতিকে দেখলে, সে কী পাগল হয়ে যেত। সুশীতল জলে অবগাহন স্নান। কী যে শরীর জুড়োনো ব্যাপার। প্রত্যেক রোমে রোমে অনুভব করছে। কারও জল ছেড়ে ওঠার ইচ্ছা নেই। তবুও জোয়ার আসার অনেক আগেই ওরা উঠে পড়ল।

অনেকটা হেঁটে ফিরতে হবে। প্রতীক, শরৎ আর রিন্টি চেঞ্জ করল। কনক আর শ্রুতির ভিজে জামাকাপড় গায়েই শুকোতে লাগল হাওয়ায়। হোটেলে পৌঁছবার অনেক আগেই তারা শুকনো খটখটে। তখন হই হই করে জোয়ারের জল আসতে শুরু করেছে। কনক শ্রুতিকে বলল, 'চলুন দিদি, আরেকবার স্নান করে আসি।'

শরতের দিকে তাকাতেই সে বলল, খুব ক্লান্ত, আর জলে নামবে না। তৎক্ষণাৎ শ্রুতি কনকের প্রস্তাব নাকচ করে দিল। তবু কনক পীড়াপীড়ি করতে থাকল, শরৎ নামে-না-নামে, কী আসে যায়। কী আসে যায় তা অবশ্য শ্রুতি কনককে বোঝাবার চেষ্টা করল না। অগত্যা তিনজনেই ঘরে ফিরে, আবার স্নানে গেল।

খাওয়ার টেবিলে শ্রুতি সরাসরি বলল, 'আজ কিন্তু দুপুরে ঘুমোনো চলবে না। তাস খেলবো।' 'হ্যাঁ অবশ্যই' উৎফুল্ল কণ্ঠ শরতের। চিরাচরিত হাল্কা খেলা টোয়েন্টি-নাইন। তাস খেলার সময়, সাধারণত বেড পার্টনাররা ইন্টার চেঞ্জ করে বসে। তাই, শরৎ-শ্রুতি আর কনক-প্রতীক পার্টনার হয়েছে। শরৎ-শ্রুতি জিতছে। হারলেই কনকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একবার সে রেগে গিয়ে হাত ফেলে দিল। বাচ্চাদের মতোন। আর খেলবে না। একচোট দাম্পত্য কলহ হয়ে গেল।

কিছুদিন আগে, শরৎ মেয়ে নিয়ে একদিন শ্রুতির বাড়ি আসায় শ্রুতি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে পাল্টা ভিজিট দেবে। তারপর, শরতের ওইটুকু মেয়ে পর্যন্ত শ্রুতির হাত ধরে, বার বার পীড়াপীড়ি করেছিল, তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য এবং এমন সময় যেন যায়, যখন সে স্কুল থেকে ফিরে আসে। অতএব, শরতের মেয়ের জন্য সামান্য উপহার নিয়ে একদিন শরতের অনুপস্থিতিতে সে কনকের সঙ্গে আলাপ করে এল। আশ্চর্য হয়েছিল জেনে যে, কনক তার কথা কিছুই জানে না। অথচ, গত তিনচার মাস যাবৎ প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে শরৎ বার তিনেক শ্রুতিদের বাড়ি আসে। নিয়মিত সকালে-রাতে ফোন করে খবর নেয়।

তাস খেলায় শরৎকে পার্টনার পেয়েছে শ্রুতি, কিন্তু বসতে হয়েছে মুখোমুখি। পাশে বসা তার আর হল না। এমনকী, হোটেল থেকে এদিক-ওদিক দশ পনেরো মিনিটের ড্রাইভেও, কনক সর্বপ্রথম গাড়ির সামনের সিট-এ উঠে বসছে।

বিকেলে বেড়াতে বেরোনোর সময় দেখা গেল, কনক নতুন-কেনা সালোয়ার কামিজ পরেছে। শ্রুতি বেড়াতে বেরিয়েছে, শাড়ি পরেই। প্রতীক কয়েকটা শট নিল। শরৎও। শ্রুতি এক ফাঁকে প্রতীককে বলে এল, 'শরতের সঙ্গে আমার একটা ছবি তুলি দিও।' প্রতীক দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, 'সে আর বলতে হবে না। আমি সুযোগ খুঁজছি।'

শ্রুতি লক্ষ্য করল, এক্সক্লুসিভলি তার সঙ্গে শরতের ছবি তুলতে প্রতীক বোধহয় পারল না। এবং ওরা এতটাই গাঁইয়া, সোজাসুজি অমন প্রস্তাব দেওয়াও যাবে না।

সন্ধেবেলা ফিরে, আবার তাস খেলা। কনক-প্রতীক আবার হারতে লাগল, অতএব খেলা জমল না। ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার দিল প্রতীক। কনক কিছু মনে করল কী না, বোঝা গেল না। শ্রুতির ভাল লাগে না, তবু প্রতীকের পীড়াপীড়িতে কয়েক চুমুক খেল। অবাক হল, কনককে দিব্যি খেতে দেখে।

পরদিন সকালে আবার তৈরি হয়ে, দূর সমুদ্রের পাশে হাঁটা দিল, সকাল সকাল ভাঁটা থাকতে থাকতে। শ্রুতি-কনক দুজনেই আজ সালোয়ার কামিজে। সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে, প্রতীক ও শরৎ চেঞ্জ করে শর্টস পরবে। প্রতীক এসব ব্যাপারে খুব চটপটে। রিন্টি ছুটে চলে গেছে জলের দিকে। শরৎ প্যান্ট বদলাবার তোড়জোড় করছে। শ্রুতি জলের দিকে এগোতে এগোতে ওদের ডাক দিতে, কনক ঝটতি জবাব দিল, 'ওঁর এখন আমাকে দরকার হবে।'

শ্রুতি খানিক থিতিয়ে গিয়ে, ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করল। কনক শরতের দিকে শর্টস আর তোয়ালে বাড়িয়ে, তার গা

ঘেঁষে দাঁড়াল। এরপর আর শ্রুতির পক্ষে সেখানে দাঁড়ানো শোভন বা সম্ভব নয়। সে প্রায় ছুটে গিয়ে জলে নামল, কোমর অবধি। কনকের সাহায্য নিয়ে শর্টস পরতে শরৎ সময় নিল অনেকক্ষণ।

গতকালকের মতোই সামগ্রিক জলক্রীড়া। কনক খুব চোখে চোখে রাখছে শরৎকে। কাছাকাছি থাকছে সবসময়। তবু, তারই ফাঁকে, শরতের হাত ধরে ডুব দেওয়ার সময় শ্রুতি, শরৎকে খুব মৃদুস্বরে বলে দিল, 'কাল ফেরার সময় আমি কিন্তু সামনে বসবো, আপনার পাশে।' বলেই শরতের হাত ছেড়ে দিয়ে কনকের হাত ধরে বলল,

'তুমিও তো সাঁতার জান। এবার তোমার হাত ধরে ডুব দেবো।'

হোটেলে ফিরে আবার স্নান। এবার একটা ডবল পিস হাউস-কোট পরে, ডাইনিং হলে এল শ্রুতি। দুপুরে তাস খেলতে শ্রুতি শরতের মুখোমুখি। নতুন বেশে শ্রুতির দিকে বারে বারেই চোখ আটকিয়ে যাচ্ছে শরতের। খেলায় মন দিতে পারছে না। প্রতীক বাকপটু নয়, তবু মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য করে ফেলে। শরৎ খুবই মুখচোরা ও লাজুক।

শ্রুতি লক্ষ্য করেছে, প্রতীকের সামনে শরৎ যেন বেশি করে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তুলনায়, শ্রুতির সঙ্গে কথাবার্তায় অনেক সহজ। প্রতীক তাস ফেলতে অনর্থক বেশি সময় নেয়। শ্রুতি অধৈর্য হয়। 'অত ভাববার কী আছে, সামান্য তাস খেলায়? চটপট তাস ফেলো।'

প্রতীক তাস থেকে চোখ সরায় না, বলে 'ছটফট করে লাভ নেই কোনও, সময় দাও দেখবে যে যার নিয়মে তোমার কাছে পৌঁছে গেছে।'

শ্রুতি বলে, 'টেকনিক জানা চাই, ওমনি ওমনি কি আর হাতে আসে।'

শরৎ বলে, 'যাই বলুন দাদা, কাল বিকেলে বৌদি যা গাট্স দেখিয়েছেন! আলাদা করে বৌদিকে আইসক্রিম খাওয়ানো উচিত আপনার।'

গতকাল সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে, ওরা লক্ষ্য করছিল এক তরুণ দম্পতি বাই টার্ন একে অপরের ছবি তুলে চলেছিল। একজন বসছে, অন্য জন তুলছে। অন্যজন দাঁড়াচ্ছে, অপরজন তুলছে, এইরকম। প্রতীক বলল, 'ওরা যদি রাজি থাকে, ওদের দুজনের যুগল ছবি তো আমি অনায়াসে তুলে দিতে পারি। ওরা নিশ্চয়ই খুশি হবে। কিন্তু কে প্রস্তাব দেবে ওদের?'

শরৎ বলল 'বেশ, বেট ফেলা যাক। যে পারবে, তার আলাদা করে আইসক্রিম ট্রিট।' প্রতীক বলল, 'এমনকী কথা! আমি এক্ষুনি বলে আসছি।' শ্রুতি বলল, 'যাও, দেখি কেমন পার!' প্রতীক আর উৎসাহ দেখাল না। শ্রুতি শরৎকে এগোতে বলল, শরৎ বলল, 'ওরে বাবা আমি! অসম্ভব।' শ্রুতি কনককে উৎসাহ দিল, সে বিরক্ত হল। শ্রুতি বলল, 'স্রেফ কমিউনিকেশন গ্যাপ। একটু কমিউনিকেট করতে পারলে, কত ফালতু সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। আমি এক্ষুনি পারি।' বলেই শ্রুতি বাকিদের বিস্মিত করে সোজা দম্পতিটির দিকে এগিয়ে গেল, তাদের একজন তখন অপর জনকে ক্যামেরায় ধরে রাখতে সাহায্য করছে। শ্রুতি ওদের কাছে গিয়ে কী ধরনের বাক্য বিনিময় করেছিল তা বাকিদের কর্ণগোচর হয়নি। কিন্তু শ্রুতি ফিরে এসে প্রতীককে বলল 'যাও, ওদের ছবি তুলে দাও।'

শরৎ শ্রুতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে ছিল। সে কথা মনে রেখে, শ্রুতি বলল, 'ঠিক মতোন কমিউনিকেশনে ওদের তো লাভই হয়েছিল।'

শরৎ বলল, 'তা হল, কিন্তু আপনার মতো সাহস কজনের থাকে?'

'সাহস না থাকলেও, যদি সাহস দেওয়া হয়?'

'তাও সাহস নেবার সাহস হয় না। কারও কারও সারা জীবনেও সাহস সঞ্চয় হয়ে ওঠে না।'

শ্রুতি মনে মনে শরতের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করে, আহত হল। সত্যি কি শরৎ কোনও দিন তার দিকে এগোতে পারবে না? চান্দিপুরের দূর সমুদ্রের মতন শান্ত স্থবির ছবি হয়ে থাকবে?

তিনদিন কাটতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত একটিবার শরৎকে একা পাওয়া গেল না। শ্রুতি মনে মনে পুড়ছিল। বিকেলে নতুন কেনা পরিপাটি ফিটিং সলোয়ার কামিজ পরে তৈরি হয়ে নামল শ্রুতি। শরৎ-প্রতীক দুজনের হাতেই ক্যামেরা। অতএব, নানা

কম্বিনেশনে ছবি তোলা হল। প্রতীক তাড়া লাগাল। সন্ধে হয়ে গেলে, সমুদ্রের ধারে ছবি উঠবে না। রিন্টি ঘোড়ায় চাপা ফোটো চায়। প্রতীক তাড়াহুড়ো করে রিন্টিকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে এগোল।

শরৎ শ্রুতি-কনক একটু এগোতেই, কনকের মনে পড়ল, তার আগের দিন ঘোড়ায় চাপা ফটোর রসিদ নিতে ভুলে গেছে। ওদের অপেক্ষা করতে বলে, কনক ওপরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শরৎ বলল, 'আসুন বৌদি, আপনার একটা ছবি তুলি।'

ঝপ করে শ্রুতির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তাড়াতাড়ি করবেন!' কেন, এ কথা বলল, শ্রুতি নিজেই অবাক হল। শরৎ কি চায় না কনক জানুক! শ্রুতি কি নিজেও চায় না, কনক দেখুক! কিন্তু শরৎ-শ্রুতি মনস্তত্ব নস্যাৎ করে। শরতের ছবি তোলা শেষ হওয়ার আগেই. কনককে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল।

শরৎ যে শ্রুতির আলাদা করে ছবি তুলছে, সে দৃশ্যটি কনকের চোখের ক্যামেরায় ধরা রইল। কনক নেমে আসতেই, শরৎ তাকেও একটা এক্সপোজার দিল।

পরদিন ভোরে বার হতে হবে। আজ আর রাত করা নয়। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে সব। প্রতীকের এক গৎ। ঘুম তার কাছে প্রায়োরিটি। সন্ধায় আবার ড্রিঙ্কস। প্রতীক আর শরৎ যখন দ্বিতীয়বার গ্লাস ভরছে, শ্রুতি কনককে বলল, 'চল, আমরা ততক্ষণ গিয়ে খাবার অর্ডার দিই। খেতে দিতেও বড় দেরি করে।'

কনক আগে যেতে রাজি হল না, বলল, 'ওরা শেষ করুক, একসঙ্গে যাব।'

গ্লাস প্রায় শেষ হচ্ছে দেখে, শরৎ তাড়া দিল কনককে, 'যাও রিন্টিকে নিয়ে চলে যাও, অর্ডার দাও, আসছি আমরা।'

প্রতীক বলল, 'চল, আমিও যাব। হোটেলের বিল মিটিয়ে আসি। নইলে কাল দেরি করাবে।'

শরৎ নিজের ঘরে গেল। বাকিরা ডাইনিং হলের দিকে। ডাইনিং হলে পৌঁছিয়ে শ্রুতির মনে পড়ল জলের বোতলগুলো ঘর থেকে আনা দরকার, আগামীকাল রাস্তার জন্য জল ভরে নিতে হবে। কনক আর রিন্টিকে টেবিলে বসিয়ে ঘরে ফিরল সে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে। নিজেদের ঘরের চাবি না ঘুরিয়ে কী ভেবে শরতের দরজায় নক করল। শরৎ দরজা খুলে দিল, 'আসুন বৌদি, অর্ডার দিয়েছেন?'

শ্রুতি শরতের পাশে বসে সোজা তার বাঁ হাত ছুঁয়ে বলল, 'আমার ইমোশন আমার ফিলিংস কি আপনাতে এতটুকু রেসিপ্রোকেটেড হয় না?'

অচঞ্চল নিষ্কম্প শরৎ মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে, ডান হাত দিয়ে শ্রুতির হাত স্পর্শ করে বলল, 'হয়, হয়, অবশ্যই হয়।' বলেই হাত সরিয়ে নিল, গুটিয়ে নিল নিজেকে। চান্দিপুরের সমুদ্রের মতন দূরে সরতে চাইল ক্রমশ। শ্রুতি কি চেয়ে চেয়ে দেখবে, কীভাবে শরৎ সরতে-সরতে ওই সমুদ্রের মতন নিথর ছবিটি হয়ে যায়! শ্রুতি হাত সরাল না।

শরৎ থেমে থেমে বলতে লাগল, 'কী জানি, আমার সমস্ত গুলিয়ে যাচ্ছে। কী যে বলা উচিত, কী যে বলতে হয়, মানে আমি ঠিক গুছিয়ে উঠত পারছি না। কী যে বলতে চাই, বুঝতে পারছি না। আই অ্যাম প্রাউড, আই ফিল অনার্ড।'

'আপনি এত ইনার্ট কেন?' শরতের হাতে চাপ দিল শ্রুতি। শরৎ কাতর হল। 'আমাকে সময় দিন, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে আমার।'

'হোক অ্যাটাক, অনেক সময় পেয়েছেন এতদিনেও জানলেন না আমাকে। আই থিঙ্ক, আই অ্যাম ফুললি এক্সপোজড। আমার মনোভাব আমি কখনও লুকোইনি। সমস্ত জেনে বুঝে, আপনি আমার কাছে আসেন, নয় কি! সারাটা দিন আমি আপনার কথা ভাবি।'

'দেখুন এ ঠিক নয়। কোথায় আমি, আর কোথায় আপনি?'

'আমার সামনে এখন, অর্জুনের পাখির মাথার মতন, আপনি ছাড়া কিচ্ছু নেই।'

'কেন এত ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছেন আমায়! এ ঠিক নয়!'—ব্যাকুল হয়ে শরৎ সুদূর সমুদ্রে সমাহিত হতে চাইল। উত্তাল ঢেউ-এর মতো ঝাঁকুনি দিল শ্রুতি, 'একশোবার ঠিক। আমরা কারও কোনও ক্ষতি করছি না। আমাদের ফ্যামিলির কাউকে ডিপ্রাইভ করছি না।'

'আপনি জানেন না কত দিকে কত কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করতে পারে।'

'না পারে না, যে যার পাওনা ঠিক পাচ্ছে—এবং পাবে।'

'ওসব তো আপনার অঙ্কের হিসেব। সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞান আপনার একদম নেই। সোস্যাল ইন্টেলিজেন্স নিল। একেবারে ট্যাক্টলেস। এই যে, আমি আপনার এত কাছে এসেছি, কারণে-অকারণে-অজুহাতে, সময়ে-অসময়ে কেন আসি? আপনার বাড়ির লোকের কাছে আমি যে মনে প্রাণে অপরাধী হয়ে আছি।'

'কীসের অপরাধ? আমার কাছে আসেন, বেশ করেন। কেন নিজেকে বোকার মতন অপরাধী ভাবছেন?'

'আপনি বলছেন, অপরাধ নেই আমার?' শান্ত সমুদ্রে আকুল ঢেউ জাগল।

'হ্যাঁ, অপরাধ নিশ্চয় আছে। সে অপরাধ আমার কাছে। আমার ভালবাসাকে যথাযথ সম্মান দিচ্ছেন না।'

শরতের শান্ত সমুদ্রে অশান্ত ঢেউ ফনা তুলছে। 'শরৎ আই লাভ ইউ, অ্যান্ড আই লাইক টু বি লাভড অলসো।'

শরতের মস্ত হাতের মুঠোর মধ্যে মুখ রাখল শ্রুতি। আলতো করে চুমো খেল। শরৎ জোয়ারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু সে নিথর-নিস্পন্দ। 'কী হল?' শ্রুতি মুখ তুলল।

'ভাবছি. আপনিও ভাবুন।'

'কী ভাবব? সব ভাল কি আজও শেষ হয়নি। বন্ধুত্ব ও ভাললাগার সিঁড়িগুলো কি আমরা পার হয়ে আসিনি? একটাই প্রশ্ন এবং জবাব দেবেন জাস্ট একটা লেটারে। অবজেকটিভ টাইপ 'হ্যাঁ'-কি 'না'!

আপনি কি আমাকে ভালবাসেন? 'হ্যাঁ' কি 'না'!

'হ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে শরৎকে জাপটে ধরল শ্রুতি। শরৎ আকুল হল, 'আমি নিজেকে সামলাতে পারব না, সেন্সে আসুন' 'সেন্সেই তো এসেছি, এইবার তুমি সেন্সিবল হও। ভালবাসাকে সম্মান দাও, লজ্জা দিও না।' বাঁধন দৃঢ়তর করল শ্রুতি।

হাল ছেড়ে, হার মানল শরৎ। নত হল, শ্রুতির গালে গাল রাখল। শরতের হাতের ঘেরে ছটফটিয়ে উঠল শ্রুতি। নিথর সমুদ্রে হুড়মুড়িয়ে জোয়ার এল। অশান্ত সমুদ্রের ভরা জোয়ারে ভেসে গেল শ্রুতি।

জোয়ার শেষে ভাটার টান। সমুদ্র আবার নিজের মনে শান্ত সমাহিত। শরৎ ভাবছিল, একি ঠিক হল! পরিণতিহীন ভালবাসা কি তার ঝড়ঝাঞ্ঝিক জীবনে জটিলতর সমস্যার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না? 'প্রেমের জোয়ারে ভাসবে দোঁহারে, এমন রাবীন্দ্রিক প্রেম কি বাস্তবে সম্ভব?' সাংসারিক প্রতিকূলতায় ভালবাসা কোথায় ঠাঁই পাবে?'

শ্রুতি ভাবছিল ভালবাসা সামাজিক জীবনের অনেক উর্ধে। ভালবাসা গর্বের, ভালবাসা গৌরবের, ভালবাসা মহিমাময়। প্রেমকে মর্যাদা দিতে হয়, হেলাফেলা করতে নেই। ভালবাসা অশান্ত সমুদ্র, ভাসাতেই জানে। ভালবাসলে, ভাসতে জানা চাই।

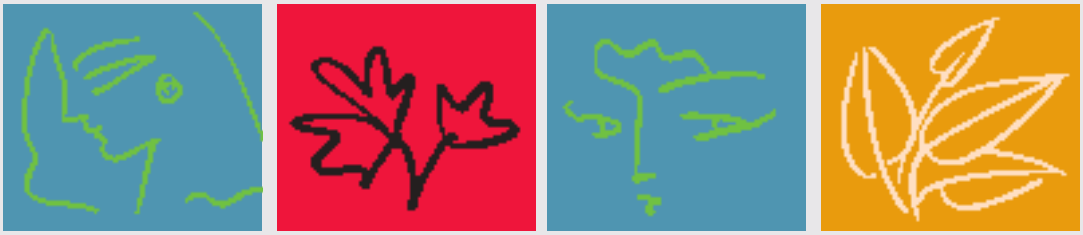

কালো মেয়ের সৌন্দর্য

‘গৌরবর্ণা কন্যা চাই’। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও, বিয়ের বিজ্ঞাপনে এই ধরনের চাহিদা এখনও রয়েছে আমাদেরই এই বঙ্গে। শুধু বাঙালির মধ্যে নয় এই বর্ণ অসচেতনতা, অর্থাৎ ফর্সা ত্বকের জন্য আজ বহু নারী ও পুরুষ হা পিত্যেশ করতে থাকেন। আমাদের একটি প্রবচন আছে ‘সর্বদোষ হরে গোরা’, অর্থাৎ ত্বকের রঙ যদি সাদা হয় তাহলে আর কোনও খুঁতই খুঁত নয়। পৃথিবীতে সর্বত্র এখন নানা দ্বন্দ্ব চলছে। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধেও চলছে লড়াই। অথচ আমাদের দেশে আজও ত্বকের রঙের উপর নির্ভর করে নারীর সৌন্দর্য, নারীর ভবিষ্যৎ। এখনও বাজারে রোজ বেরচ্ছে নতুন নতুন ক্রিম, লোশন, জড়িবুটি যুক্ত পেস্ট বা পাউডার, যা নাকি ত্বকের রঙ পরিষ্কার করবে। আর আমাদের দেশবাসীও সেই ফর্সা রঙের মোহে ছুটছে অহরহ।

এই ফর্সা রঙের প্রতি আকর্ষণ কেন? আমাদের দেশের মানুষ প্রধানত বাদামি বা কফি রঙা—এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ এ দেশ প্রখর সূর্যতাপের দেশ। আমাদের দেশে পূজিত হন নীলবর্ণ দেবদেবী। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, মা কালী। সুন্দরী হিসেবে খ্যাত দ্রৌপদীও কিন্তু গৌরবর্ণা ছিলেন না। এবং শুধু পঞ্চপাণ্ডবই নয়, কৌরবেরাও দ্রৌপদীর প্রতি ছিলেন আকৃষ্ট। তবে আমাদের দেশবাসীর গৌরবর্ণের প্রতি এমন আকর্ষণ যে এখন যে ‘মহাভারত’ ধুমধাম করে হচ্ছে টিভিতে, সেখানে দ্রৌপদীই বলুন বা শ্রীকৃষ্ণ বলুন সবাই ঝকঝকে ফর্সা।

ফর্সা রঙের জন্য আমাদের দেশের মেয়েদের কী আকুতি, কী প্রচেষ্টা। সর, ময়দা, বেসন, ক্রিম, মেখে চেষ্টা একটাই—রঙ যাতে পরিষ্কার হয়। ত্বক চর্চা অবশ্যই দরকার, এমনকী রোদের সঙ্গে যুঝতে সানস্ক্রিনও চাই। কিন্তু সৌন্দর্য শুধুই ত্বকে আটকে থাকে, এটা ভাবা একেবারে ভুল।

কী নারী কী পুরুষ তার সৌন্দর্য নিহিত তার দেহসৌষ্ঠব, মুখশ্রী, স্বভাব, শিক্ষা, কথা-চলা-বলা সব কিছুর সমন্বয়। সুতরাং শুধু রঙের পিছনে ছোটা নিছকই কুহকিনী মোহ বই আর কিছু নয়। তাই এবারে সুবিধার পক্ষ থেকে **শিল্পী রায়** মতামত সংগ্রহ করেছেন নানা বুদ্ধিজীবীর। পড়ে নিন কৃষ্ণা সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তাঁদের কাছে কী।

রং দিয়ে বিচার বর্বরতা

প্রচেত গুপ্ত, গল্পকার

বাহ্যিক সৌন্দর্য কোনও মানুষেরই স্থায়ী হয় না। তাই আলাদা করে নারীরও নয়, গায়ের রং তো পরের কথা। পৃথিবীতে এমন বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁদের গায়ের রং প্রকৃত অর্থেই কালো, অথচ তাঁরা নিজ নিজ কেন্দ্রে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে মানুষের চোখের মণি হয়েছেন। এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে নারীর সংখ্যাও কম নয়। অথচ আমার খুব অবাক লাগে যখন এরপরেও দেখি চিহ্নিত মানুষেরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেন ফর্সা মেয়ের চাহিদায়। আমার মতে, সাদা-কালোর বিচার এক ধরনের বোকা বিচার। ফর্সা হলেই কোনও মেয়ে সুন্দরী বা কালো হলেই যে কুৎসিৎ, তা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ যে কোনও মেয়েরই রূপের বিচার করা উচিত তার স্বভাব, শিক্ষা, রুচিবোধের নিরিখে। রঙের বিচারে নয়। আমি আবারও বলতে চাই, আজকের এই দুহাজার তেরো সালে দাঁড়িয়েও বহু তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষকে নির্লজ্জের মতো ফর্সা পাত্রীর চাহিদায় বিজ্ঞাপন দিতে দেখি, যা অত্যন্ত লজ্জার। সাদা-কালোর প্রতি আকর্ষণ একটা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়, তবে রঙের নিরিখে নারীকে বিচার করা অর্থহীন। কবিগুরু তথা বহু সাহিত্যিক ও কবির লেখনীতে কালো মেয়ের সৌন্দর্যের কথা বার বার ফুটে উঠেছে। একটি কালো মেয়েকে প্রধানত ছোট করা হয় বিয়ের বিজ্ঞাপনের বাজারে। আশাকরি এই নির্লজ্জ বর্বরতাও একদিন বন্ধ হবে।

সাদা-কালোর বিচারে যেতে চাই না

রূপঙ্কর, গায়ক

আমি মানুষকে সাদা-কালোর বিচারে কখনওই বিচার করি না। সে নারী হোক কিংবা পুরুষ। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে মানুষের মনটাই হল আসল। একজন আপাত ফর্সা সুন্দরীকেও ভীষণ কুৎসিৎ লাগে, যখন তার নোংরা মনের পরিচয় আমরা পাই। আবার একজন কৃষ্ণাও সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হয়ে ওঠে তার সুন্দর মন নিয়ে। একটি মেয়ে প্রথমে একজন মানুষ তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্ত্বা আছে, নিজস্ব রুচিবোধ আছে। সেই নারীকে সাদা কালোর বিচারে বিচার করে সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে আমি নারাজ।

মা-এর মাপকাঠি কি রং হতে পারে?

বিশ্বনাথ বসু, অভিনেতা

কালো মেয়ে কথাটা শুনেই মনে পড়ে গেল কবিগুরুর গানের কথাগুলি, 'কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' কালো মেয়ে বলতেই আমার প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে গেল তার নাম সিমি গারেওয়াল। আরেক কৃষ্ণা সুন্দরীর নাম না করলেই নয়, তিনি রেখা। যে কোনও পুরুষের কাছেই রেখার মতো আবেদনময়ী অভিনেত্রী খুব কমই আছেন বোধহয়। কোনও মেয়েরই রংটা তার সৌন্দর্যের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে উঠতে পারে না। আমি মানুষের ব্যবহারকে বিশ্বাস করি, মানুষের মানবিকতাতে বিশ্বাস করি, তার গভীরতাও বিশ্বাস করি। এখানে রঙের প্রয়োজন কোথায়? যে কোনও মেয়েরই কালো হলে আপাত ভাবে মনে হয় সে অনেকটা পিছিয়ে আছে। তাই তার নিজের অনেকটা দায়িত্ব এসে পড়ে নিজেকে অন্যভাবে প্রমাণ করার। বিয়ের বাজারে হয়ত একটি কালো মেয়ে কিছুটা উপেক্ষিতই হয়। তবে এখন দিন বদলেছে, যুগ বদলেছে, এখন বিয়ে মানেই ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে যাওয়া নয়, গায়ের রং বা এক গলা ঘোমটা নয়। এখন বিয়ে মানে প্রকৃত অর্থেই দুটি মানুষের ইচ্ছা ও চাহিদার সম্মিলিত পথ চলা। আমার মতে, সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিতের মাঝখানের প্রভেদ যেদিন মুছে যাবে, সেদিনই কালো মেয়েকে পিছিয়ে রাখার ধারনাও আশাকরি বদলে যাবে। মেয়ে হল মা, মেয়ে হল স্ত্রী, এদের কখনওই রঙের বিচারে বিচার করা উচিত নয় বা কাম্য নয়। জাগতিক নিয়মেই হোক আর প্রাকৃতিক নিয়মেই, স্ত্রীর সৌন্দর্য বা রূপের প্রয়োজন খুব স্বল্পকালের, তারপর কিন্তু তার ব্যবহারই মুখ্য হয়ে ওঠে। আর শেষে বলি মায়ের ভালবাসা কি রঙের মাপকাঠিতে বিচার করা যায়, না করা উচিত?

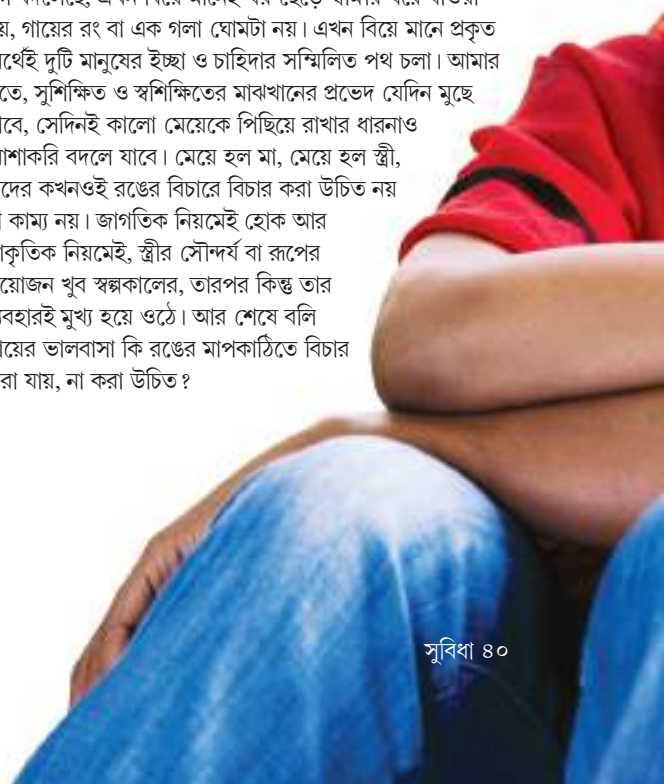

আমাদের দ্বৈতসত্ত্বাই কালো-সাদা ভেদ আনে

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, চিত্রনাট্যকার

কালো রঙের প্রতি আমাদের যে বিরূপ ধারণা তা বোধহয় এসেছে পাশ্চাত্যের সাহেব মেমদের দেখে। এই ধারণাটা আমার কাছে একেবারেই অর্থহীন।

অপর দিকে বলব একজন বুদ্ধিমতী কালো মেয়ে আমার ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকায় থাকবেন। কারণ একটি মেয়ের রং ছাড়াও তার শারীরিক গঠন, ব্যক্তিত্ব এমন অনেক কিছু থাকে যা তাঁর সৌন্দর্য সহায়ক। আজকাল তো সারা পৃথিবীর মানুষই কালো হওয়ার চেষ্টায় ট্যান করছে নিজেদের শরীর। ভারতবর্ষের খোলা বাজারে ফর্সা হওয়ার ক্রিম বেচা খুবই সহজ। আর সেকারণেই বিজ্ঞাপনের ছটায় আকৃষ্ট হয়ে সবাই হামলে পড়ে মেয়েদের ফর্সা করার চেষ্টায়। বিয়ের বাজারে যে ফর্সা মেয়েদের জয়জয়কার তাও বোধহয় এসেছে ওই সাদা চামড়ার মানুষগুলোকে দেখে। সেই কারণেই আমরা বোধহয় শ্যামলা মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই দুধের সর, হলুদবাটা মাখিয়ে ফর্সা করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। তবে আমার কাছে কৃষ্ণা মেয়ের সৌন্দর্যের আবেদন অনেক বেশি। অরণ্যের দিনরাত্রি ছবিতে আমার সিমি গারওয়ালকে যত ভাল লেগেছে অন্য কোনও ছবিতে আবার এত ভাল লাগেনি, এবং তা মনে হয় কালো রঙের জন্যই। আবার টেনিস সুন্দরী স্টেফিগ্রাফের চেয়ে সাবাতিনীকে আমার অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগে তার ট্যান রঙের জন্য। আসলে আমরা সকলেই প্রায় দ্বৈতসত্ত্বার চরিত্র বিশিষ্ট, তাই যদিও আমরা মনে মনে কল্পনা করি একটি বুদ্ধিমতী চকচকে কালো মেয়ের পরক্ষণেই আবার ভাবি আমাদের সন্তান কালো হবে নাতো। এই ধারণা আমাদের মনে ট্যাবু হয়ে আছে। এবং এর জন্যও বিজ্ঞাপনী বাজার অনেকাংশে দায়ী। শেষে যদি সেনসুয়ালিটির দিক থেকেও বলা যায় সেখানেও একটি ফর্সা মেয়ের থেকে একটি কালো মেয়ের রংটা তার কাছে বাড়তি পাওনা।

ভাল বাসলে রঙের প্রয়োজন কোথায়?

রূপম ইসলাম, গায়ক

সুন্দরীরা শুধুই সুন্দরী, ফর্সা বা কালো রং দিয়ে তাদের বিচার করা যায় না। আমার পছন্দের যে সব সুন্দরীরা রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন নাওমি ক্যাম্পবেল। তার গায়ের রং কিন্তু কালো। তবুও আবার বলছি ফর্সা/কালো এই রঙের ভেদাভেদ টা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আর যদি বিয়ের বাজারে ফর্সা মেয়ের চাহিদার কথা বলা হয় তবে বলব বিষয়টি অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। কারণ আমি বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানকেই ঠিক বিশ্বাস করি না। একজনকে ভাল লাগল বা তার সঙ্গে থাকতে হলে বিয়ের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। একজনকে ভালবেসে তার কাছে থাকতে হলে সেখানে রঙের প্রয়োজন কোথায়?

এই লজ্জা আমাদের সকলের

শ্রীজাত, কবি

আমি নিজে বরাবরই বাদামি বা কালো রঙের প্রতি আকৃষ্ট। আমার পছন্দের নায়িকা, যাঁরা ছবিতে অভিনয় করেন তাঁদের প্রতি আমি বেশি আকৃষ্ট হয়েছি, যখন তাঁরা শ্যামলা রঙের অধিকারিনী। এক কালো সুন্দরী নায়িকা হলেন স্মিতা পাটিল, অসম্ভব ভাল লাগে নন্দিতা দাসকেও। তাঁর অভিনয় সত্ত্বার পাশাপাশি, তাঁর গায়ের রং যদি ওরকম কালো না হত, তবে হয়ত তিনি আমার এত প্রিয় হয়ে উঠতেন না। হলিউডের আরেক প্রিয় নায়িকার নাম হ্যালি বেরি। এই যে বুদ্ধির সঙ্গে রঙের মিশেল এই জায়গাটা আমার অসম্ভব ভাল লাগে। কালো রং আমাদের মাটির রঙের খুব কাছাকাছি। তাই যে কোনও কালো মেয়েকে আমি নিজের মনের কাছাকাছি আনতে পারি। আমরা তো খুব পিছিয়ে পড়া একটা দেশে বাস করি। এই দেশে এখনও সমগোত্রীয় বিয়ে না হলে মেয়েটির মাথা কেটে ফেলা হয় বা ছেলেটিকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। আমাদের মধ্যে খুব কম শতাংশ মানুষই একটু অন্যরকম চিন্তা ভাবনা করে। তবে আমি পজিটিভটাই ভাবব। আমার মতে মানুষের বিচার, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও রুচি দিয়ে হওয়া উচিত। আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা খুবই প্রাসঙ্গিক যে আজও আমাদের দেশে কালো মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে আছে। তাদের বিয়ের পথে অনেক অন্তরায়। এটা অত্যন্ত লজ্জার এবং এই লজ্জা আমাদের সকলের।

নভেম্বর মাস অর্থাৎ কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস কেমন যাবে তার আগাম কিছু আভাস দিচ্ছেন শ্রীগুরু।

মেষ রাশি

কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের যোগ আছে। বিবাহ সূত্রে শুভ যোগাযোগ। সন্তান হওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হলে শুভ। অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। শুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : সবুজ ; শুভ বার : বুধ ; শুভ খাবার : বেগুন ; অশুভ খাবার : কাঁচা টোম্যাটো।

বৃষ রাশি

শিক্ষার ফল খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাড়িতে আত্মীয় সমাগম ও গুরুজন বিয়োগ হতে পারে। দূর ভ্রমণ নিষিদ্ধ। পেটের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। বাইরের খাবার না খাওয়াই শ্রেয়। শুভ সংখ্যা : ৩ ; শুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; শুভ খাবার : বিট, গাজর ; অশুভ খাবার : মটর শুঁটি।

মিথুন রাশি

উচ্চ শিক্ষার্থীদের বাইরে যাওয়ার সুযোগ, হঠাৎ বিয়ে-র সম্ভাবনা। নতুন কাজে সাফল্য আসতে পারে। নিজে গাড়ি চালাবেন না। খাবার ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন। পেটের সমস্যার সম্ভাবনা। শুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : মেরুণ ; শুভ বার : সোম ; শুভ খাবার : ছোট মাছ ; অশুভ খাবার : তেল, ডিম।

কর্কট রাশি

আটকে থাকা অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে। বাড়ি বানানোর বা ক্রয়ের সুসময়। গৃহঋণ পাওয়ার ভাল সময়। নতুন কাজে সুযোগ বৃদ্ধি। চলাফেরার ক্ষেত্রে সাবধান, বিশেষত জলপথে। যে কোনও যানেই সাবধানতা অবলম্বন করুন। শুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : সবজি, রুটি ; অশুভ খাবার : পুঁই শাক।

সিংহ রাশি

স্বাধীন কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হবেন। তবে এক্ষুনি নতুন ব্যবসায় না যাওয়াই ভাল। বিয়ের ক্ষেত্রে জন্মস্থানের বাইরে শুভ, প্রেম বা সম্বন্ধ করে বিয়ে দুই ক্ষেত্রেই। চাকরি সূত্রে বাইরে যাওয়ার উচিত সময়। শুভ সংখ্যা : ২ ; শুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : বুধ ; শুভ খাবার : আটা ; অশুভ খাবার : শাক।

কন্যা রাশি

প্রতিবেশী ভাগ্য ভাল নয়। বচসার সম্ভাবনা প্রবল। বিয়ে স্থির হয়ে ভেঙে যেতে পারে। নতুন বন্ধু লাভের সম্ভাবনা। বিদেশ যাত্রীর শুভ সময়। তবে যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অশুভ যোগ। শুভ সংখ্যা : ২ ; শুভ রঙ : লাল ; শুভ বার : শুক্র ; শুভ খাবার : শামুক ; অশুভ খাবার : মাছের তেল।

তুলা রাশি

স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও বাড়তি দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেবেন না। ব্যবসায় শুভ সময়, একাধিক পথে অর্থ আসতে পারে। তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন দিন। বিয়ের ক্ষেত্রে অশুভ। শুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : সাদা ; শুভ বার : সোম ; শুভ খাবার : দালিয়া ; অশুভ খাবার : ভাত।

মকর রাশি

আগুন, জল ও বিদ্যুতের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। হঠাৎ রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জন্মস্থানের বাইরে শুভ হবে। বিয়ে ও সন্তান লাভের শুভ যোগ। তবে, যাই করবেন সতর্কতা অবলম্বন করে তবেই। শুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : আকাশি ; শুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : মুগডাল ; অশুভ খাবার : বিউলির ডাল।

কুম্ভ রাশি

ভাবনা চিন্তা করে অর্থলগ্নী করলে লাভবান হতে পারেন। তবে শেয়ার মার্কেট বা ফাটকা বাজির ক্ষেত্রে বেশি অর্থলগ্নী অনুচিত। পুলিশি জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। নিয়ম বর্হিভূত কাজ করা অনুচিত। শুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : মেরুণ ; শুভ বার : সোম ; শুভ খাবার : মাছ ; অশুভ খাবার : মাছের ডিম।

মীন রাশি

ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ প্রবল। হোটেল, রেস্তোরাঁ, মাছের চাষ শুভ। ভ্রমণ সূত্রে বিয়ে শুভ। সন্তান লাভের সম্ভাবনা প্রবল। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক। শুভ সংখ্যা : ২ ; শুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ বার : শুক্র ; শুভ খাবার : রুটি, শুক্তো ; অশুভ খাবার : কড়াইশুঁটির কচুরি।

বৃশ্চিক রাশি

হঠাৎ খাবারের মধ্যে দিয়ে বিষক্রিয়া হতে পারে। ব্যবসায় শুভ। কৃষি প্রধান ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হবেন। নতুন কাজের সুযোগ আসবে। শুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : সবুজ ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; শুভ খাবার : চিংড়ি মাছ ; অশুভ খাবার : রুই মাছ।

ধনু রাশি

শেয়ার মার্কেটে অর্থলগ্নী করলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। একক কর্মে উন্নতির যোগ আছে। কাজের জন্য চাপ বেড়ে শারীরিক ও মানসিক চাপ বাড়বে। শুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : নীল ; শুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : পোস্ত ; অশুভ খাবার : সরষে।

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida® 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

Suvida®

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

গর্ভনিরোধক বড়ি

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।